কার্ভালোর বাক্স
সমরেশ মজুমদার
9 788172 150761

এখন কোনও কাজকর্ম নেই। তিন-তিনটে মাস শুধু বই পড়ে আর ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়ে মন মেজাজ বিশ্রী হয়ে গিয়েছিল অর্জুনের। থানার দারোগা অবনীবাবু হেসে বলেছিলেন, "মানুষের স্বভাব বড় অদ্ভুত। এই যে আমার জেলায় কোনও বড় ক্রাইম হচ্ছে না, গত চার-পাঁচ মাসে কিছু চুরি ডাকাতি ছাড়া কোনও প্রব্লেম নেই, এতে সবার খুশি হওয়ার কথা কিন্তু হাঁপিয়ে উঠছেন আপনি। ধরুন, এই শহরে ছ' মাস ধরে কারও কোনও অসুখ করল না, এমনকী সর্দিজ্বরও নয়, সবাই হঠাৎ একদম ফিট হয়ে গেল তাতেও একদল মানুষ অখুশি হবে। ডাক্তাররা। তাঁরা বেকার হয়ে যাবেন।"

অর্জুন হেসে ফেলেছিল। ব্যাপারটা হয়তো তাই। কিন্তু দুটো সমস্যার চেহারা একরকম নয়। তবে অবনীবাবু ভাল মানুষ। থানার দারোগা হয়েও দেশ-বিদেশের খবর রাখেন। শহরে এসেছেন বছরখানেক হল। অমলদা, অমল সোমের সঙ্গে আলাপ করার খুব ইচ্ছে ছিল ওঁর, কিন্তু হয়নি। অমলদা বেশ কিছুদিন মৌনী নিয়ে ছিলেন, কারও সঙ্গে দেখা করতেন না। তারপর একদিন হাবুর হাতে একটা চিঠি ধরিয়ে আগের বারের মতো দেশ ঘুরতে বেরিয়ে গেছেন।

বিকেলবেলায় অবনীবাবুর ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। এর মধ্যে একবার চায়ের প্রস্তাব করেছেন ভদ্রলোক, অর্জুন রাজি হয়নি। থানার চা এত খারাপ যে, মুখে দেওয়া যায় না। কথাটা সে ভদ্রলোককে বলতে পারেনি। ওই চা মুখে দিয়ে প্রতিবার অবনীবাবু "আঃ" বলে শব্দ তোলেন।

থানার বিল্ডিংটার ওপর লেখা রয়েছে কোতোয়ালি। এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। কোতোয়ালি হল কোতোয়ালের অফিস। কোতোয়াল মানে কোটাল, নগরপাল। শব্দগুলো এখন শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের শ্যামা নৃত্যনাট্যে, 'বলরে নগরপালে'। বাস্তবের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। অবনীবাবু বললেন, "হিন্দিভাষাভাষী মানুষেরা শব্দটাকে এখনও ব্যবহার করেন মশাই। আফটার অল হিন্দি তো আমাদের রাষ্ট্রভাষা। ভাবুন, তখন কী দিন ছিল! আমি কোটাল, নগররক্ষক। কী খাতির। তখন টিয়ার গ্যাস ছিল না, বন্দুক ছিল না, শুধু অসির ঝনঝনানি।"

"অবজেকশন!" পেছন থেকে একটা হেঁড়ে গলা ভেসে এল।

অর্জুন দেখল, ঘরের এক কোণে একজন বসে আছেন। ভদ্রলোকের বয়স সত্তরের কাছে, গায়ে ময়লাটে সাদা পাঞ্জাবি, গায়ের রং বেশ কালো। অবনীবাবু ভদ্রলোকের দিকে পিটপিট করে তাকালেন, "মানে ?"

"আজ পর্যন্ত অসি হাতে কোনও কোটালের ঘুরে বেড়ানোর গল্প পড়ার সুযোগ হয়নি। তখন একটা লাঠি আর দড়িই ছিল সাফিসিয়েন্ট। আর কোতোয়াল শব্দটি এসেছে ফারসি 'কোৎরাল্' থেকে— বাংলা ভাষায় লেখা যে-কোনও অভিধানে পেয়ে যাবেন।" ভদ্রলোক একটানা বললেন।

"অ। আপনি যেন কী কাজের জন্যে এখানে এসেছেন ?" অবনীবাবু একটু বিরক্ত।

"ছোট দারোগাকে বলেছি। তিনি এখানে আসতে বললেন। এসে ইস্তক আপনাদের কথা শুনছি।"

"ঠিক আছে। এবার বলতে পারেন।"

"আগে আমার পরিচয়টা দিয়ে নিই। দেওয়ার মতো অবশ্য কিছু নয়। পিতৃদেব নাম রেখেছিলেন রাম, রামচন্দ্র রায়। এককালে ভাল ফুটবল খেলতাম। রাইট ইনে। তখন তো ওইসব আধুনিক ছক চালু হয়নি। ফরোয়ার্ড লাইনেই পাঁচজন থাকত। আমি পুরো মাঠ চষতাম। প্রচণ্ড দম ছিল তো ?"

অবনীবাবু হাত তুলে ভদ্রলোককে থামিয়ে বললেন, "ওটা নিশ্চয়ই আপনার ছেলেবেলার ঘটনা। আমরা আপনার এখনকার পরিচয় জানতে চাইছি।"

রামচন্দ্র বললেন, "ঠিক ছেলেবেলা বলা যাচ্ছে না। আমি আঠারো বছরে খেলা ছেড়েছি। একটু বেশি কথা বলছি বোধ হয়, শর্টকাট করি, জাহাজে চাকরি করতাম। পৃথিবীটা চক্কর দিয়েছি। আর জাহাজে জানেনই তো, সমুদ্রে ভাসলে হাতে অফুরন্ত সময়। তখন বই পড়েছি। পছন্দ বলে তো কিছু ছিল না, হাতের কাছে যা পেয়েছি। দু-দুটো অভিধান মুখস্থ হয়ে গেল ওই সময়।"

অর্জুন অবাক হয়ে গেল। ভদ্রলোকের শরীরের গঠন বেশ মজবুত হলেও চেহারায় বোঝা যায় বেশ অর্থকষ্টে আছেন। সে না বলে পারল না, "অদ্ভুত"।

"অদ্ভুত কেন ? আপনার হাতে যদি কোনও কাজ না থাকে, যদি একটা ঘরে কয়েক মাস বন্দি থাকেন এবং প্রচুর উল আর কাঁটা ধরিয়ে দেওয়া হয় তা হলে আপনিও সোয়েটার বুনতে শিখে যাবেন। পরিস্থিতি আপনাকে বাধ্য করবে শিখতে।"

"ইন্টারেস্টিং।" অর্জুন বলল, "আপনি একটু এপাশে এগিয়ে আসুন

না।”

রামচন্দ্র উঠে দাঁড়ান, “ধন্যবাদ, না বললে আমি আগ বাড়িয়ে কাছে যাই না।” একটা চেয়ার ফাঁকা রেখে বসলেন ভদ্রলোক। কাছাকাছি হওয়ার পর অর্জুন ভদ্রলোককে লক্ষ্য করল। গম্ভীর দাদু-দাদু চেহারা। মুখে বেশ সৌম্য ভাব, মানুষটিকে একটুও কুটিল বলে মনে হয় না।

অবনীবাবু বললেন, “আপনার পরিচয়টা এখনও জানলাম না। আপনি ফুটবল খেলতেন, জাহাজে চাকরি করতেন। এখন আপনি কী করেন ?”

রামচন্দ্রবাবু মাথা নাড়লেন, “ওইটাই মুশকিল হয়ে গিয়েছে। ওরা আমাকে মিডিয়াম বানিয়ে ফেলেছে। প্রথম-প্রথম মজা লাগত, এখন এত অসহায় মনে হয় নিজেকে....।”

“মিডিয়াম ? কিসের মিডিয়াম ?” অবনীবাবু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন।

“আমি যা করতে চাই না, তাই ওরা আমাকে দিয়ে করায়।” রামচন্দ্র নিচুস্বরে বললেন।

“আই সি ! তার মানে এখন আপনি ক্যারিয়ার ! আপনার মতো বয়স্ক সরল চেহারার মানুষ ক্যারিয়ার হলে পুলিশের বাবার সাধ্য নেই যে সন্দেহ করবে। ওদের হয়ে কী ক্যারি করেন আপনি ? ড্রাগ না স্মাগলিং গুড্স ?” অবনীবাবু সোজা হয়ে বসলেন।

“আজ্ঞে, ঠিক তা নয়, আপনি...।” রামচন্দ্র বিড়বিড় করলেন।

“বুঝতে পেরেছি। কিন্তু হঠাৎ আপনি নিজেকে সারেন্ডার করতে এলেন কেন ? এই সুমতি কি স্বাভাবিক ? ঠিক আছে, তার আগে বলুন আপনি কোথায় থাকেন ?” কলম খুললেন অবনীবাবু।

“আপনি ভুল করছেন। আমি স্মাগলার বা ড্রাগকারবারীদের ঘৃণা করি। খবরের কাগজে আমি এই নিয়ে প্রচুর লিখেছি। কলকাতার লিডিং ড্রাগকারবারী পাশা আমার রিপোর্টের জন্যে ধরা পড়ে। তা ছাড়া যে অভিধান মুখস্থ বলতে পারে সে ওই কাজ করতে পারে না।” বেশ রাগত ভঙ্গিতেই প্রতিবাদ জানালেন রামচন্দ্রবাবু।

“খবরের কাগজ ? খবরের কাগজে আপনি কী করতেন ?”

“সাব এডিটার ছিলাম। কিন্তু প্রায়ই ফিচার লিখতাম, মাঝে-মাঝে স্কুপও।”

“ভাবা যায় না। আপনি ফুটবল খেলতেন, জাহাজে চাকরি করতেন, আবার খবরের কাগজে চাকরি করেছেন। অদ্ভুত জীবন তো। তা হলে এই যে বললেন আপনাকে ক্যারিয়ার হতে ওরা বাধ্য করছে, সেটা তা হলে কী ?” অবনীবাবু ধাঁধায় পড়ে গেছেন বোঝা গেল।

“আমি একবারও বলিনি কেউ আমাকে ক্যারিয়ার করেছে। আমি বলেছি আমাকে ওরা মিডিয়াম বানিয়ে নিয়েছে এবং এতে আমার কিছুই

করার নেই।" গম্ভীর গলায় বললেন ভদ্রলোক।

"কারা আপনাকে মিডিয়াম বানিয়েছে?" অবনীবাবুর গলার স্বরে একটু হালকা হাসি মিশল।

"আমি ঠিক জানি না কিন্তু অনুভব করতে পারি। মুশকিল হল, এ-ব্যাপারে আমি অসহায়। আমার ইচ্ছের কোনও মূল্য নেই। ওরা যা চাইবে তাই আমাকে করতে হবে। শেষপর্যন্ত ভেবে দেখলাম আপনার কাছে আসাই ভাল। আমি একটা ডায়েরি করতে চাই।"

"ডায়েরি? কার বিরুদ্ধে?" হাসি চাপতে পারলেন না অবনীবাবু। আর সেটা দেখে বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন রামচন্দ্র রায়, "সত্যি বলতে কী, কারও বিরুদ্ধে নয়। আমি চাইছি ব্যাপারটা রেকর্ডেড হয়ে থাক। ধরুন, ওরা আমাকে দিয়ে কাউকে খুন করালো, তখন এই রেকর্ডটা কাজে লাগবে।"

এই সময় টেলিফোন বাজল। বাঁ হাতে রিসিভার তুলে অবনীবাবু সাড়া দিলেন। ওপাশের বক্তব্য শুনতে-শুনতে তিনি সোজা হয়ে বসলেন, তারপর "আসছি" বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। অর্জুন ওঁর এই ভঙ্গি চিনে ফেলেছে। কোথাও কিছু ঘটেছে এবং অবনীবাবুকে এখনই সেখানে যেতে হবে।

"সরি, মিস্টার রায়, আমি আপনাকে ঠিক এই মুহূর্তে সাহায্য করতে পারছি না। আপনি বাড়িতে গিয়ে আর একবার ভাবুন। তারপরেও যদি মনে হয় এখনকার ভাবনাটাই ঠিক তা হলে আর একদিন আসবেন। আমাকে এখনই তিস্তার চরে যেতে হচ্ছে।" অবনীবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "সিরিয়াস কিছু ঘটেছে নাকি?"

"না। জায়গাজমি নিয়ে ঝামেলা। আপনি কি বসবেন?"

"না। আর বসে কী করব। আপনি এগোন, আমি আসছি।"

অর্জুনের কথা শুনে চোখে এমন একটা ইশারা করলেন অবনীবাবু রামচন্দ্রবাবুকে উদ্দেশ করে যে, তার একটাই অর্থ হয়, পাগলের পাল্লায় পড়বেন না মশাই। অবনীবাবু ঘরের বাইরে চলে গেলে অর্জুন রামচন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোনদিকে যাবেন?"

"আমি? রাজবাড়ির কাছে।" রামচন্দ্রবাবু উঠে দাঁড়ালেন, "আচ্ছা, আমার কথাবার্তা কি খুব অ্যাবনর্মাল শোনাল? মানে, পাগলের প্রলাপ বলে মনে হল?"

হকচকিয়ে গেল অর্জুন, "না, না। এ-কথা আপনার মনে হচ্ছে কেন?"

"মনে হল।" মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, "আপনি পুলিশের লোক?"

"আজ্ঞে না। আমি মাঝে-মাঝে এখানে গল্প করতে আসি।"

"আশ্চর্য! থানাতে কেউ গল্প করতে আসে বলে শুনিনি।"

"আসলে অবনীবাবু, মানে উনি, মানুষ ভাল। আর আমার প্রোফেশনের সঙ্গে উনি জড়িয়ে আছেন। এখানে এসে নানান ধরনের মানুষের কথা শুনি, সেটা কাজেও লাগে।"

"কী প্রোফেশন আপনার?"

"সত্যসন্ধান।"

অদ্ভুত চোখে তাকালেন রামচন্দ্রবাবু। যেন শব্দটির মানে বোঝার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, "নাম কী ভাই?"

"অর্জুন।"

"ও, আপনিই অর্জুন। নাম শুনেছি কিন্তু বয়স এত অল্প, আন্দাজ করিনি। আচ্ছা, আমাদের বোধ হয় এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। চলুন, বাইরে যাই।" রামচন্দ্র রায় দরজার দিকে এগোলেন। এই মুহূর্তে ভদ্রলোককে যথেষ্ট সুস্থ এবং বিবেচক বলে মনে হচ্ছে। অর্জুনের মনে হল, মানুষটি একটু আলাদা ধরনের। হঠাৎ সে আকর্ষণ বোধ করতে লাগল।

বাইরে বেরিয়েই রামচন্দ্র রায় বললেন, "সন্ধে হয়ে গেল। মুশকিল।"

"মুশকিল কেন?"

"আমি রাতের বেলায় ঘরের বাইরে থাকতে চাই না। যতক্ষণ আলো থাকে ততক্ষণ আমি নিরাপদ।"

"কী আলো? আপনি সূর্যের আলোর কথা বলছেন?" অর্জুন মোটরবাইকের চাবি বের করল।

"হ্যাঁ। সূর্যালোক। সেই আদিকাল থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমরা যে এককালে প্রকৃতিকে উপসনা করে তাদেরই দেবদেবী বানিয়েছিলাম সেটাই ঠিক ছিল। আচ্ছা, চলি।" রামচন্দ্রবাবু হাত জোড় করলেন।

"আপনি কি বাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়তে চাই।"

"যদি কোনও অসুবিধে না হয় আপনাকে আমি লিফ্‌ট দিতে পারি।" অর্জুন নিজের লাল মোটরবাইক্‌টাকে দেখাল। তার অবশ্য একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল। অনেককেই সে বাইকের পেছনে বসিয়েছে কিন্তু রামচন্দ্র রায়ের বয়সী কোনও বৃদ্ধকে পেছনে বসিয়ে বাইক চালায়নি! সে ভেবেছিল বৃদ্ধ আপত্তি জানাবেন কিন্তু উলটোটা হল। রামচন্দ্রবাবু সোৎসাহে বললেন, "তা হলে তো ভালই হল। আগে পৌঁছে যাওয়া যাবে।"

বাইকে স্টার্ট দিয়ে অর্জুন ইশারা করতেই বৃদ্ধ ধুতি সামলে পেছনে উঠে বসলেন। তাঁর হাত অর্জুনকে আঁকড়ে ধরতেই সে আপত্তি জানাল, "আমাকে নয়। আপনার আর আমার মাঝখানে একটা হাতল আছে,

সেটা ধরুন। খুব ইজি হয়ে বসে থাকুন। পাদানিতে পা রেখেছেন? গুড।"

রামচন্দ্রবাবু বললেন, "এত টেনস্‌ড হওয়ার দরকার নেই। আমি প্রশান্ত মহাসাগরে একা-একা প্যাড্‌লিং করেছি। অমন ঢেউ বঙ্গোপসাগরে ওঠে না।"

জাহাজে যিনি চাকরি করেছেন তিনি সমুদ্রে অনেক কিছু করতে পারেন। অর্জুন আলো জ্বালিয়ে থানা থেকে বের হতে-না-হতেই বুঝল রামচন্দ্রবাবু স্বাভাবিকভাবে বসে নেই। তাঁর শরীর শক্ত হয়ে গেছে এবং একদিকে হেলে আছেন। সে সতর্ক হয়ে চালাতে লাগল। একটুও গতি না বাড়িয়ে শহরের জনাকীর্ণ এলাকা বাদ দিয়ে একটু ঘুরে করলা নদী পেরিয়ে রায়কতপাড়ার দিকে এগোতে লাগল। বাইক চলার পর থেকে মাঝে-মাঝে ঘোঁত-ঘোঁত করে শ্বাস নেওয়া ছাড়া রামচন্দ্রবাবু কোনও শব্দ করেননি। রাজবাড়ির গেটের কাছে পৌঁছে সে বাইক থামাল, "এবার কোনদিকে যাব?"

কোনও সাড়া এল না। অর্জুন মুখ ফিরিয়ে দেখল বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। সে আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনার বাড়ি কোন দিকে?"

এবার চোখ খুললেন বৃদ্ধ, "আমরা কোথায় এসেছি?"

"ঠিক রাজবাড়ির গেটের সামনে।"

"আর একটু এগিয়ে, ডান দিকে।" রামচন্দ্রবাবু নিশ্বাস ফেললেন, "নীল রঙের বাড়ি।"

অর্জুন বাইকটাকে খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যেতেই একটা নীল রঙের বাড়ি দেখতে পেল। সেই বাড়িতে কোনও আলো জ্বলছে না। কোনও মানুষ আছে বলেও মনে হচ্ছে না। সাদাসাপটা একতলা বাড়ি। অর্জুন স্টার্ট বন্ধ করে বলল, "নামুন।"

রামচন্দ্রবাবু যেভাবে নামলেন তাতে মনে হল ওঁর শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট নেই। দাঁড়ানোর পরও তিনি টলতে লাগলেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার শরীর খারাপ লাগছে?"

"সেরকম নয়। আসলে ভেতরে-ভেতরে খুব দুর্বল হয়ে গেছি দেখছি। এই একমাসে ওরা আমাকে এতটা কাহিল করে দিয়েছে বুঝতে পারিনি। কী ছিলাম, কী হয়ে গেলাম।"

অর্জুন বৃদ্ধকে ধরে ধীরে-ধীরে বাড়িটার দরজায় নিয়ে গিয়ে দেখল দরজায় তালা ঝুলছে।

রামচন্দ্রবাবু পাঞ্জাবির পকেট থেকে একথোকা চাবি বের করে রাস্তার আলোর সামনে তুলে ধরলেন। তারপর একটাকে বেছে নিয়ে তালা খুললেন। ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালার পর তাঁকে অনেক স্বাভাবিক

দেখাল। অর্জুন বলল, "তা হলে এবার আমি যাই।"

"যাই মানে? এতদূরে পৌঁছে দিলেন, একটু কফি না খাইয়ে ছাড়ব কেন?"

"কী দরকার—।"

"নাথিং। কোনও দরকার নেই। আসলে এখন আপনি থাকলে আমার ভাল লাগবে।" দরজা বন্ধ করে বেতের চেয়ার দেখিয়ে দিলেন রামচন্দ্রবাবু।

"বাড়িতে আর কেউ নেই?"

"কে থাকবে? নান্। এই পৃথিবীতে আমি একা। আরে ভাই নাবিকের কাজ করতাম। নিজের কাজ নিজে করার অভ্যেস এমন তৈরি হয়ে গেছে যে, কারও অভাব অনুভব করি না। শুধু এই একমাস ধরে। আর ওই কার্ভালোটাই আমার সর্বনাশ করল।"

"কার্ভালো কে?" অর্জুনের মনে পড়ল সেই ঐতিহাসিক চরিত্রটির কথা, যাকে নিয়ে নাটক হয়েছে।

"আমার বন্ধু। জাহাজে একসঙ্গে কাজ করতাম। দাঁড়াও, জল বসিয়ে আসি।" রামচন্দ্র চলে গেলেন ভেতরে। অর্জুন তাকিয়ে দেখল এই ঘরে চারটে বেতের চেয়ার আর গোল টেবিল ছাড়া অন্য কোনও আসবাব নেই। শুধু পেছনের দেওয়ালে একটা বিরাট ছবি ঝুলছে। ছবিটি জাহাজের। নাবিকের বাড়ি বলেই সম্ভবত জাহাজের ছবি। হয়তো ভদ্রলোক ওই জাহাজেই অনেকদিন কাজ করেছেন। রামচন্দ্রের বন্ধু কার্ভালো। অদ্ভুত ব্যাপার। অর্জুন মনে-মনে হাসল। এতক্ষণ ধরে ভদ্রলোককে যা দেখেছে তাতে পাগল বলে মনে করার মতো কিছু ঘটেনি। কথায়-কথায় অবশ্য একমাসের কথা শোনাচ্ছেন, কেউ বা কারা নাকি ওঁকে মিডিয়াম বানাচ্ছে। এই কারণেই তিনি থানায় গিয়েছিলেন ডায়েরি করতে। ব্যাপারটা পুরো না শুনলে হাস্যকর লাগা স্বাভাবিক। অপরাধ করে বা না করে গ্রেফতারের সম্ভাবনা থাকলে কেউ-কেউ কোর্টে যান আগাম জামিন চাইতে। এই প্রথা চালু আছে। কিন্তু কেউ আমাকে দিয়ে কোনও অপরাধ করিয়ে নিতে পারে বলে আশঙ্কা করে আজ পর্যন্ত কেউ কোথাও ডায়েরি করছে বলে সে শোনেনি। অর্জুনের কেবলই মনে হচ্ছিল রামচন্দ্র রায় মিথ্যে কথা বলেননি। তা হলে উনি কার মিডিয়াম হচ্ছেন?

কফির ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকে বেতের চেয়ারে রাখলেন রামচন্দ্রবাবু। চিনি আলাদা পাত্রে রয়েছে। পাশের ছোট কাপে সামান্য দুধ। বললেন, "আমি চিনি-দুধ খাই না। আপনার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু মিশিয়ে নিন।"

চুপচাপ রান্নার কাজটা সেরে কফিতে চুমুক দিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস

করল, "এই বাড়িতে আপনি কদ্দিন আছেন ? নিজের বাড়ি ?"

"আছি বছরখানেক। হ্যাঁ, নিজের বাড়ি। কিনেছিলাম বছর কুড়ি আগে। এতদিন ভাড়াটে ছিল। অনেক কষ্টে তাদের তুলে এখানে এলাম। এই বাড়ির একটা গল্প আছে।"

"কীরকম ?"

"এই জমিটা ছিল আমার বাবার। জলপাইগুড়ির রাজার কাছ থেকে পেয়েছিলেন তিনি। আমি জন্মাবার পরে তিনি মারা যান। অভাবের তাড়নায় মা এই জমিটাকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়ে আমাকে নিয়ে চলে যান মামার বাড়িতে। মামা থাকতেন বালুরঘাটে। সেখানেই আমার শৈশব কাটে। মায়ের মনে খুব দুঃখ ছিল জমিটা বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে। কুড়ি বছর আগে আমি এই শহরে ফিরে এলাম জমিটাকে আবার কিনে নেব বলে। নিজেদের জমি অনেক বেশি দাম দিয়ে কিনতে হল। তখন অবশ্য মা পৃথিবীতে নেই। এই বাড়ি বানিয়ে ভাড়া দিয়ে চলে গিয়েছিলাম সে-সময়।"

রামচন্দ্রবাবু চোখ বন্ধ করে মুখ ওপরে তুললেন, "কিছু শুনতে পাচ্ছেন ?"

অর্জুন অবাক হয়ে শোনার চেষ্টা করল, "কই না তো !"

"একটা মেটালিক সাউন্ড। টানা ?"

"না। আমার কানে কিছু আসছে না।"

"আপনি তো সত্যের সন্ধান করেন। আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। পুলিশ কী করবে জানি না, আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন ?"

"আপনি কী সাহায্য চাইছেন ?"

"আমাকে বাঁচান। গত এক মাস ধরে, ওই কার্ভালো আসার পর থেকেই এই ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছে। রোজ রাত্রে কেউ বা কারা আমাকে অথর্ব করে দিচ্ছে। তখন আমার কোনও ইচ্ছাশক্তি থাকে না। আমি তাকাই কিন্তু কিছু দেখি না, আমি শুনি কিন্তু বলতে পারি না।"

"আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে সেইসব ভৌতিক গল্পের মতো।"

হাত তুলে বাধা দিলেন রামচন্দ্রবাবু, "না, না। ভুল করবেন না। এরা ভূত নয়। কর্মজীবনে আমি অনেক ভূতের গল্প শুনে খুঁজতে গিয়ে কিছুই পাইনি। অবশ্য তারা সবাই সামুদ্রিক ভূত। ইন ফ্যাক্ট, ভূত বলে কিছু আছে আমি বিশ্বাস করি না।"

"যারা আপনাকে অবশ করে দেয়, তাদের আপনি দেখতে পান ?"

"না। কিন্তু অনুভব করতে পারি। আর অনুভব মানে পুরো দেখা নয়। মনে হয় প্রচণ্ড শক্তিধর ওরা। আমাকে যা বলছে তা না করে আমার উপায় নেই। ধরুন, ওরা যদি আমাকে বলে কাউকে খুন করে

আসতে, তা হলে সেটা আমি নিজের অজান্তেই করে ফেলব। তারপর দিনের বেলায় পুলিশ যখন আমাকে অ্যারেস্ট করবে তখন বোঝাতে পারব না ওটা স্ব-ইচ্ছায় করিনি। আমি ঝড়, জল, উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করেছি। একবার অতলান্তিকে দশদিন লাইফবোটে ভেসে ছিলাম। কিন্তু এখানে আমি অসহায়, লড়াই করার কোনও সুযোগই নেই।" বলতে-বলতে হঠাৎ চুপ করে গেলেন রামচন্দ্র রায়, "শুনতে পাচ্ছেন এবার ? সিগন্যালিং টিউন ?"

অর্জুন কিছুই শুনতে পেল না। কিন্তু ওর মনে হল বৃদ্ধ বানিয়ে গল্প বলছেন না। ব্যাপারটার পেছনে সত্যতা আছে। সে জিজ্ঞেস করল, "কার্ভালোর বয়স কত ?"

"অলমোস্ট মাই এজ। আমার তিন মাস বাদে কাজ ছেড়েছে সে।"

"উনি কেন এসেছিলেন আপনার কাছে ?"

"একসঙ্গে জাহাজে কাজ করেছি। ভালই সম্পর্ক ছিল। ও অবশ্য বিবাহিত। দমনে নিজের বাড়ি। যে লাইফবোটে আমরা ভাসতে বাধ্য হয়েছিলাম তাতে ও আমার সঙ্গী ছিল। আমার ঠিকানা কার্ভালো জানত। হঠাৎ এক দুপুরে সে আমার কাছে এসে হাজির।"

"তারপর ?"

"খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল ওকে। একটা রাত ছিল। তার পরদিন হঠাৎই চলে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল অসমের দিকে যাচ্ছে। ফেরার সময় দেখা করে যাবে। আর হ্যাঁ, ওর সঙ্গে কিছু লাগেজ ছিল, তার একটা রেখে গেল ঝামেলা কমাতে।"

"কী লাগেজ ?"

"একটা সুটকেস।"

"দেখতে পারি সেটা ?"

"মানে ? কার্ভালোর সুটকেস তার অনুমতি ছাড়া খোলা ঠিক হবে ?"

"উনি একমাস হল অসমে চলে গেছেন। থাকেন সেই দমনে। এর মধ্যে আপনাকে কোনও চিঠি লেখেননি। যদি আর কখনও ভদ্রলোক ফিরে না আসেন তা হলে কী করবেন ?"

"তা কেন ? ফিরে আসবে না কেন ?"

"আপনিই বললেন ভদ্রলোককে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। ওই সুটকেসে কী জিনিস তিনি রেখে গিয়েছেন তা কে বলতে পারে। হয়তো বেআইনি কিছু, যার জন্যে পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করতে পারে।"

"আমাকে কেন করবে ? সুটকেস তো আমার নয়।"

"কী করে প্রমাণ করবেন ? ওটা তো আপনার হেফাজতে পাওয়া যাবে।"

"আচ্ছা !" রামচন্দ্র রায় গালে হাত বোলালেন, "কিন্তু ওর চাবি তো

আমার কাছে নেই।"

"সুটকেসটা কোথায় ?"

"পাশের ঘরে।"

"চলুন।" অর্জুন কফির কাপ রেখে উঠে দাঁড়াল।

নিতান্ত অনিচ্ছায় রামচন্দ্রবাবু পাশের ঘরে ঢুকলেন। এ-ঘরে একটা খাট, আলমারি এবং কিছু নিত্য ব্যবহারের জিনিসপত্র আছে। ঘরের কোণে একটা সুটকেস দাঁড় করানো। বাজারে চলতি এক নামী কোম্পানির দামি সুটকেস। কোনও ঢাকনা না থাকায় দীর্ঘ যাত্রার চিহ্নস্বরূপ প্রচুর দাগ সুটকেসের শরীরে। রামচন্দ্রবাবু বললেন, "এইটি কার্ভালোর সুটকেস।"

অর্জুন হাঁটু মুড়ে বসে সুটকেসের লক পরীক্ষা করল। না, চাবি দিয়ে খোলার ব্যবস্থা নেই। নম্বর ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কোড মিললে ওটা খুলবে। সুটকেসটি যথেষ্ট মজবুত। এই সুটকেস খোলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে নিশ্চয়ই খোলা যায় কিন্তু সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "ল্যাংড়া-পাঁচুকে ডেকে আনতে হবে।"

"ল্যাংড়া-পাঁচু ?"

"এই শহরের সবচেয়ে ওস্তাদ তালা-খুলিয়ে ! আগে এটাই ব্যবসা ছিল। আমি একবার ওকে বাঁচিয়েছিলাম। কিন্তু ল্যাংড়া-পাঁচুকে এখন পাওয়া যাবে না। কাল সকালে ওকে নিয়ে আসব। আমি এখন চলি, আপনি বিশ্রাম করুন।"

"কিন্তু, কিন্তু আজ রাত্রেও ওরা আসবে।"

"নাও আসতে পারে।"

"অসম্ভব। আমি সিগন্যাল্ শুনতে পাচ্ছি। ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।"

"আপনি কি চাইছেন আমি এখানে থাকি ?"

রামচন্দ্রবাবু তাকালেন, "নাঃ। থাক। আপনি কাল সকালে আসবেন বললেন ?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে একটু তাড়াতাড়ি আসবেন। আর যাওয়ার সময় বাইরের দরজায় তালা দিয়ে যান। আমি যদি এই বাড়ি থেকে বের হতে না পারি তা হলে নিজের অজান্তে কোনও অন্যায় করা সম্ভব হবে না।" চাবির থোকাটা এগিয়ে ধরলেন বৃদ্ধ।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওঁর কথা মান্য করল অর্জুন। বাইক চালু করে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল বাড়িটার জানলাগুলো খোলেননি রামচন্দ্রবাবু। আলো বেরিয়ে আসছে ঘুলঘুলি দিয়ে। সে গতি বাড়াল।

জেলখানার কাছে এসে বাইক থামাল অর্জুন। তার মনে হল, এটা

ঠিক নয়। একজন মানুষকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সারারাত বাড়িতে বন্দি করে রাখা উচিত হচ্ছে না। শরীর খারাপ হলেও বাড়ি থেকে বেরোতে পারবেন না ভদ্রলোক। কেউ এলে দরজা খুলে দিতে পারবেন না। সে বাইকটাকে বাঁ দিকে ঘোরাল।

ল্যাংড়া-পাঁচু এক সময় এই শহরের খুব নামী অপরাধী ছিল। যে-কোনও তালা খুলে দিতে তার জুড়ি ছিল না। চোর-ডাকাতদের কাছে তাই ওর খুব চাহিদা ছিল। নিজে চুরি বা ডাকাতি না করলেও টাকা নিয়ে দলের সঙ্গে গিয়ে তালা খুলে দেওয়ার অপরাধে অনেকবার জেল খেটেছে সে। শেষবার একটা ডাকাতির কেসে তালা খোলার অভিযোগে পুলিশ ওকে গ্রেফতার করে। ডাকাতরা বাড়ির দরোয়ানটিকে মেরে ফেলেছিল। সেই খুনের দায় ল্যাংড়া-পাঁচুর ঘাড়েও চেপেছিল। কিন্তু পুলিশ ডাকাতদের ধরতে পারেনি, ল্যাংড়া-পাঁচুকে ধরেছিল অনুমানের ওপর নির্ভর করে। ল্যাংড়া-পাঁচুর বউ ছুটে গিয়েছিল অমলদার কাছে। তার স্বামী নিরাপরাধ, অন্তত ওই ডাকাতির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, ডাকাতির রাত্রে পেট খারাপ হওয়ায় সে বাড়িতেই শুয়ে ছিল, এইসব বলে অমলদার সাহায্য চেয়েছিল পাঁচজনের পরামর্শে। অমলদা সেই মহিলাকে প্রশ্ন করেই নিশ্চিত হন ল্যাংড়া-পাঁচু নিরাপরাধ। তিনিই অর্জুনকে নির্দেশ দেন ল্যাংড়া-পাঁচু সম্পর্কে পুলিশের ভুল প্রমাণ দাখিল করে ভাঙিয়ে দিতে। বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছিল সেবার অর্জুনকে। আর তারপর থেকেই ল্যাংড়া-পাঁচু ওকে খুব সমীহ করে। অর্জুনের কাছে কথা দিয়েছিল তালা খোলার কাজ সে ছেড়ে দেবে। ল্যাংড়া-পাঁচু এখন লটারির টিকিট বিক্রি করে কদমতলার মোড়ে। কিন্তু সন্ধে হলেই লোকটা খারাপ আড্ডায় চলে যায়। এই সময় তাকে দিয়ে কিছু করানো অসম্ভব। এই নেশার পেছনে তার যুক্তি হল, ওখানে গেলেই মাথার ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যায়, তখন কোনও পার্টি এসে হাজার টাকা দিলেও সে তালা খুলতে পারবে না। চোর-ডাকাতরা ব্যাপারটা জেনে যাওয়ায় এখন আর ল্যাংড়া-পাঁচুকে বিরক্ত করে না।

ল্যাংড়া-পাঁচুকে এই সময় বাড়িতে পাওয়া যাবে না। দু'দিন রাত দশটার পরে তাকে বুঁদ হয়ে বাড়ি ফিরতে দেখেছে সে। কিন্তু কোথায় কোন আড্ডায় যায় তা নিশ্চয়ই ওর বউ জানে। বাইক নিয়ে অর্জুন সোজা ল্যাংড়া-পাঁচুর বাড়িতে চলে এল। শহরের একপ্রান্তে খুবই গরিব পরিবেশে ল্যাংড়া-পাঁচু থাকে। ভেতরে হ্যারিকেন জ্বলছে। বাইকের আওয়াজ পেয়ে কিছু কৌতূহলী মানুষের সঙ্গে ল্যাংড়া-পাঁচুর বউও বেরিয়ে এসে ওকে দেখে ঘোমটা টানল, "ওমা আপনি ?"

"পাঁচুবাবু আছে ?"

"আজ্ঞে, এই সময়— আপনি তো সব জানেন !"

"হ্যাঁ, কোথায় গিয়ে খায় ওসব ? আমার খুব দরকার ওকে।"

ল্যাংড়া-পাঁচুর বউ ঠিকানাটা বুঝিয়ে দিয়ে বলল, "একটু দাঁড়ান।"

অর্জুন বাইকে বসে দেখল মহিলা ঘরের ভেতর চলে গেল দৌড়ে। ছেলে, বুড়ো, মহিলারা তাকে দেখছে। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে তাকে নিয়ে। একটু পরে মহিলা ফিরে এসে একটা কাগজের মোড়ক দিল, "কথা বলতে না পারলে এইটে দেবেন। আপনার উপকার আমি জীবনে ভুলতে পারব না বাবু। শুধু এই খারাপ আড্ডাটা যদি ওকে ছাড়িয়ে দেন।"

অর্জুন কোনও মন্তব্য না করে মোড়কটি নিয়ে বাইক ঘোরাল। হাসপাতালের উলটো রাস্তায় ঢুকে নির্দিষ্ট একটা বাড়ির ভেতরের বারান্দায় ল্যাংড়া-পাঁচুকে পাওয়া গেল। দু' হাতে ছিলিম ধরে টান দিতে গিয়ে তাকে দেখে থমকে গেল, "আপনি ?"

"যাক, ঠিক আছ এখনও। একটু এসো, কথা আছে।"

করুণ দৃষ্টিতে হাতে ধরা জিনিসটার দিকে একবার তাকিয়ে সঙ্গীদের একজনের হাতে তুলে দিয়ে ল্যাংড়া-পাঁচু নেমে এল বারান্দা থেকে, "বলুন বাবু।"

"তোমার মাথা ঠিক আছে ?"

"আজ্ঞে ? ও, প্রথম টান দিতে যাচ্ছিলাম। আজ সন্ধে-সন্ধে বেশ খদ্দের হয়ে যাওয়ায় এখানে আসতে দেরি হয়ে গেল। একদম ঠিক আছে মাথা।" ল্যাংড়া-পাঁচু মুখ নিচু করল।

"তা হলে তোমার বউয়ের দেওয়া এই জিনিসটার দরকার হচ্ছে না !"

মোড়কটা দেখল ল্যাংড়া-পাঁচু। দেখে হাসল, "তাই বলুন। এই ঠিকানা সে দিয়েছে। এই কাগজে কী দিয়েছে জানেন ? দ্যাখেননি ? তেঁতুল। নেশার পর তেঁতুল খেলেই আমার বমি হয়ে যায়।"

"বুঝলাম।" বাইক চালু করে অর্জুন হুকুম করল, "পেছনে ওঠো।"

ল্যাংড়া-পাঁচু ইতস্তত করছিল কিন্তু আদেশ অমান্য করছিল না। বাইক চলতে আরম্ভ করলে সে বলল, "আপনি যা ভাবছেন তা নয়। ইচ্ছে করলে আমি দিনের পর দিন নেশা না করে থাকতে পারি। আসলে সময় কাটে না বলেই এই আড্ডায় চলে আসি।"

অর্জুন কিছু বলল না। সে রামচন্দ্র রায়ের বাড়ির দিকে যেতে লাগল। সেটা লক্ষ্য করে ল্যাংড়া-পাঁচু বলল, "ও, যা ভেবেছিলাম তা নয়।"

"কী ভেবেছিলে ?" বাইক চালাতে-চালাতে জিজ্ঞেস করল অর্জুন।

"আমি ভেবেছিলাম আবার আমাকে থানায় ঢোকাচ্ছেন আপনি।"

"আড্ডাটা না ছাড়লে সেটা করতে হবে।"

"আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন, যা বলবেন তাই করব।"

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। রামচন্দ্র রায়ের বাড়ির সামনে পৌঁছে বাইক থামাল সে। ল্যাংড়া-পাঁচু নেমে দাঁড়ালে সে বলল, "শোনো, এই বাড়িতে একটা সুটকেস আছে। চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। তোমাকে খুলে দিতে হবে।"

কথা বলে সে এগিয়ে গিয়ে বাইরের দরজার তালা খুলে ডাকল, "মিস্টার রায়।"

"যাচ্ছি।" ভেতর থেকে গলা ভেসে এল।

বাইরের ঘরের আলো জ্বেলে অর্জুন ল্যাংড়া-পাঁচুকে বসতে বললে সে সন্তর্পণে চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করল, "সুটকেসটা কার বাবু ?"

"কেন ?" চমকে তাকাল অর্জুন।

"যার সুটকেস তিনি সামনে না থাকলে আমি ওটা খুলব না বাবু ?"

"হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত ?"

"আজ্ঞে, হঠাৎ নয়। আপনি ছাড়াবার পর আমি তো এই কারবার ছেড়ে দিয়েছি। কত টাকার লোভ দেখানো হয়েছে কিন্তু আমি বলেছি, মন, তুই নরম হসনি। একটা কেস মানে কয়েক বছর জেল। তাই অন্যের সুটকেসে হাত দিই না।"

ল্যাংড়া-পাঁচুর সিরিয়াস মুখের দিকে তাকিয়ে অর্জুন একটু অপ্রস্তুত হল। জেলের ভাত খাওয়া থেকে বের করে নিয়ে সে নিজে ল্যাংড়া-পাঁচুকে বলেছিল অন্যের তালা মালিকের অজান্তে যেন কোনওদিন না খোলে। সেই কথাই আজ ল্যাংড়া-পাঁচু সুযোগ বুঝে ফিরিয়ে দিল। সে বলল, "দ্যাখো, তুমি যখন অন্যের অজান্তে তালা খুলতে তখন মানুষের সর্বনাশ হত। আজকের কাজটা করলে একজন ভাল মানুষের উপকার হবে। তার চেয়ে বড় কথা, আমি তোমাকে অন্যায় কিছু করতে বলব না।"

অর্জুনের কথা শেষ হওয়ামাত্র রামচন্দ্র রায় হাজির হলেন, "কী ব্যাপার ? কাল সকালে আসার কথা ছিল না ?"

অর্জুন বৃদ্ধকে দেখল, "আপনি ঠিক আছেন তো ?"

"তার মানে ?"

"বাঃ, আপনিই তো বলেছেন কারও সিগন্যাল শুনতে পাচ্ছিলেন।"

রামচন্দ্রবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "ওসব ব্যাপার হালকাভাবে না বলাই ভাল। এখন বলুন কী জন্যে আবার ফিরে আসতে হল ! আমি তো রাত্রের খাওয়া সেরে নিলাম।"

"ভালই করেছেন। ইনি হলেন পাঁচুবাবু। এঁর কথা খানিক আগে আপনাকে বলেছি।" অর্জুন হাসল, "সুটকেসটাকে দেখাতে চাই।"

রামচন্দ্র কথা খরচ না করে ওদের ভেতরের ঘরে নিয়ে এলেন। ল্যাংড়া-পাঁচু সুটকেসটায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর নম্বর

ঘোরাবার জায়গাটায় আঙুল বোলাতে লাগল। অর্জুন সেটা লক্ষ্য করে বলল, "ওহো, এই কথাটা বলা হয়নি। চাবি ঢুকিয়ে তালা খোলার সুটকেস এটা নয়। ঠিকঠাক নম্বর এলে এর ডালা খুলে যায়।"

ল্যাংড়া-পাঁচু হাসল, "নম্বরই বলুন আর চাবিই বলুন, ভেতরে তো একটা তালা আছে। হুকটা আটকে আছে তাতে। একটু অনুভব করতে দিন।"

রামচন্দ্র রায় জিজ্ঞেস করলেন, "অনুভব ? শক্ত সুটকেসের বাইরে হাত দিয়ে ভেতরটা অনুভব করা যায় ?"

"যে যেমন পারে। তারে আঙুল দিলে কেউ শুধুই টুং টাং শব্দ করে, কেউ গান বাজায়। একটু চুপ করুন আপনারা। পারব কি না জানি না, তবু চেষ্টা করতে দিন।" ল্যাংড়া-পাঁচু চোখ বন্ধ করল।

এক, দুই করে বেশ কয়েক মিনিট যাওয়ার পর ল্যাংড়া-পাঁচু বলল, "ওই যাঃ। যন্ত্রপাতি তো সঙ্গে আনিনি। এমনভাবে চলে আসতে হল ! একটা সরু অথচ শক্ত তার পাওয়া যাবে ?"

রামচন্দ্রবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সরু তার পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত ইলেকট্রিকের তার রবারের ভেতর থেকে বের করে পাকিয়ে কী এক অদ্ভুত কায়দায় সোজা করে চেষ্টা চালাল ল্যাংড়া-পাঁচু। প্রায় আধঘণ্টা ধরে নাছোড়বান্দা ল্যাংড়া-পাঁচু পড়ে রইল সুটকেস নিয়ে। শেষতক খট করে একটা শব্দ হতেই তার গলায় উল্লাস শোনা গেল, "হুঁঃ। হবে না মানে ? আঙুলগুলো মরে গেছে নাকি ! নিন বাবু, ডালাটা খুলুন। আপনিই দেখুন ভেতরে কী আছে !"

সুটকেসটাকে টেনে এনে অর্জুন ডালা খুলল। সুটকেসের ভেতরে টাইট করে বসিয়ে রাখা হয়েছে থার্মোকোলের বাক্স। সেটাকে বাইরে বের করতে খানিকটা অসুবিধে হল। ওপরের ঢাকনা খোলার পর আবার একটি থার্মোকোলের বাক্স। খুব ভঙ্গুর অথচ মূল্যবান জিনিসকেই মানুষ এমন যত্নে সতর্কতার সঙ্গে রাখে। দ্বিতীয় বাক্সটা খুলতেই একটা নীল আলোর দপদপানি টের পাওয়া গেল। চকচকে এক ধাতব বস্তু থেকে নীল আলো জ্বলছে-নিভছে।

ল্যাংড়া-পাঁচু জিজ্ঞেস করল, "এ কি জিনিস বাবু ?"

অর্জুন তল পাচ্ছিল না। সে যন্ত্রের কাছে কান নিয়ে গিয়েও কোনও শব্দ শুনতে পেল না। একটা চকচকে চৌকো বাক্স। আলোটা জ্বলছে-নিভছে ওর ভেতরে। ওপরের ছিদ্র থেকে তার একটা অংশ ছিটকে আসছে। সে যন্ত্রটার গায়ে হাত বোলাতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল রামচন্দ্র রায় যে সিগন্যাল শোনেন তা এখান থেকেই বের হয় না তো !

"ওটা সরিয়ে ফেলুন।" পেছন থেকে রামচন্দ্রবাবুর চাপা গলা শোনা

গেল।

"এটা কী? আমি এরকম জিনিস কখনও দেখিনি। কার্ভালো কি কিছু বলেছে আপনাকে?"

"না, কার্ভালো কিছু বলেনি। কিন্তু ওটা সরিয়ে ফেলুন।" রামচন্দ্রবাবুর গলা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল।

"কেন?"

"যে-সিগন্যালটা আমি শুনি তা এই ঘরে ঢুকে ওই বাক্সের মধ্যে যেন মিলিয়ে যায়। কাল রাত্রেও আমার মনে হয়েছিল সেটা। আপনাদের বলতে পারিনি।"

"এই বাক্সে মিলিয়ে যায়, না বাক্স থেকে শব্দটা বের হয়?"

"আঃ, বললাম তো বাক্সে ঢুকে যায়। তখন তো বাক্স জানতাম না, মনে হত সুটকেসেই ঢুকে যাচ্ছে শব্দটা। প্লিজ, সরিয়ে ফেলুন ওটাকে।"

"আপনি এমন ভয় পাচ্ছেন কেন? সারা পৃথিবী ঘুরেছেন আপনি!"

"তাতে কিছু লাভ নেই। ওরা যখন আমাকে মিডিয়াম করে তখন নিজের কোনও ক্ষমতা থাকে না। একদম পুতুল হয়ে যাই তখন। আমার সামনে থাকলে ওরা যদি চায় তো আপনাকেও খুন করতে পারি। কিন্তু শব্দটা ওই সুটকেসের ভেতর ঢুকে না যাওয়া পর্যন্ত আমি ঠিক থাকি।" রামচন্দ্রবাবুকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিল। অর্জুন যন্ত্রটাকে দেখল। অমলদা থাকলে কী করতেন? এটা কি তা হলে রিসিভার গোছের কিছু? কী রিসিভ করছে? কে সিগন্যালিং করে? হঠাৎ তার মাথায় অন্য চিন্তা এল। মহাকাশ থেকে ওই সিগন্যাল ভেসে আসছে না তো?

সে চটপট যন্ত্রটাকে থার্মোকোলের মধ্যে ঢোকাল। দুটো বাক্সকে সুটকেসে নিয়ে সে রামচন্দ্রবাবুকে বলল, "আমি যদি এটা আজকের রাত্রের জন্যে নিয়ে যাই, আপনার আপত্তি হবে?"

"আপত্তি? আপত্তি কিসের। তবে কার্ভালোর জিনিস, আর ওরা যদি এখানে এসে না পায় তা হলে হয়তো আমার ওপরে খেপে যেতে পারে—।" বিড়বিড় করছিলেন বৃদ্ধ।

"যদি কেউ এসেও থাকে এই বস্তুটি না থাকলে আপনার কাছে আসবে না।" অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "কদমতলার চৌধুরী মেডিক্যাল স্টোর্স চেনেন?"

রামচন্দ্র মাথা দোলালেন।

"চৌধুরী মেডিক্যালে গিয়ে আমার নাম বললে ওরা বাড়ি দেখিয়ে দেবে। কাল সকালে একবার আসুন। এসো পাঁচু।" সুটকেস নিয়ে বাড়ির বাইরে পা বাড়াল অর্জুন।

"বাইরে থেকে তালা দিয়ে যাবেন না ?" রামচন্দ্র রায় কাতর গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

"আমার বিশ্বাস, তার প্রয়োজন হবে না।"

সুটকেস নিয়ে বাইকে ওঠা খুব মুশকিল। সে ল্যাংড়া-পাঁচুকে জিজ্ঞেস করল, "এটাকে ধরে বসে থাকতে পারবে ? ডালা খোলাই আছে।"

ল্যাংড়া-পাঁচু এককথায় রাজি। পেছনের সিটে বসে সুটকেসটাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, "বাবু, এটা খুব দামি জিনিস, না ?"

"হুঁ।" অর্জুন অন্যমনস্ক ছিল।

"কীরকম দাম হবে ?"

"জানি না। রামচন্দ্র রায়ের কথা যদি ঠিক হয় তা হলে এর কোনও দাম কেউ দিতে পারবে না। শক্ত করে ধরে রাখো।" অর্জুন বাইকে গতি দিল। পেছনে বসা ল্যাংড়া-পাঁচু সোৎসাহে বলে উঠল, "আঃ। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম !"

অর্জুন সোজা থানায় চলে এল। অবনীবাবু তখনও ফেরেননি। সেকেন্ড অফিসার শঙ্করবাবু অর্জুনকে দেখে মুখ খুলতে গিয়ে থেমে গেলেন পেছনে ল্যাংড়া-পাঁচুকে বসে থাকতে দেখে।

বাইকে বসেই অবনীবাবুর খবরটা জেনে ইতস্তত করছিল অর্জুন। শঙ্করবাবু ল্যাংড়া-পাঁচুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আবার ফেঁসেছ ? একদম সুটকেস সমেত তোমাকে ধরেছেন মনে হচ্ছে !"

অর্জুন বাইক থেকে নেমে সুটকেসটাকে হাতে নিল, "শঙ্করবাবু একটা উপকার করতে হবে।"

"নিশ্চয়ই ! বলুন, এ আবার কাজ আরম্ভ করেছে তো ?"

"না। ওকে আমিই নিয়ে এসেছি। আপনাদের এখানে মাটির নীচে একটা ঘর আছে না ? মানে যেখানে দামি জিনিস রাখা হয় ?"

"হ্যাঁ।"

"এই সুটকেসটাকে ওখানে আজকের রাত্রের জন্যে রেখে যেতে চাই।"

"ও। কী আছে ওতে ?"

"মহামূল্যবান একটা জিনিস, কিন্তু কাল সকালের আগে এটা খোলা যাবে না।"

"তা হলে তো মুশকিল হল।"

"কেন ?"

"খাতায় লিখতে হয় কী জিনিস রাখছি। দামি জিনিসের জন্যে এই নিরাপত্তা।"

"ও। লিখুন সিগন্যালিং মেশিন।"

"তাই বলুন। স্মাগলিং গুড। রাখাটা বেআইনি কিন্তু আপনি বলেই

রাজি হচ্ছি। দিন।"

"না। আমি নিজের হাতে রেখে আসব। তুমি এখানেই থাকো পাঁচু।"

শঙ্করবাবুর পেছন-পেছন থানার ভেতরে ঢুকে একটা বিশেষ ঘরের মধ্যে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল অর্জুন। লোহার দরজায় দুটো তালা ঝুলছে। পাশের টেবিলে খাতা। সেই খাতায় লেখাপত্র শেষ করে সেপাইকে দিয়ে দুটো চাবি আনিয়ে দরজা খুললেন শঙ্করবাবু। খুব অন্ধকার। সুইচ টিপে আলো জ্বালতেই কয়েকটা র‍্যাক দেখা গেল। সবক'টা র‍্যাকই শূন্য। অর্থাৎ, এই মুহূর্তে থানায় কোনও মূল্যবান জিনিস জমা নেই।

সুটকেসটাকে এমন একটা কোণে ঢুকিয়ে দিল অর্জুন যে, সরাসরি টেনে বের করে আনা যাবে না। আলো নিভিয়ে লোহার ভারী দরজা বন্ধ করে তালা দিয়ে দেওয়া হল। সে শঙ্করবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "ব্যবস্থা মজবুত তো?"

"মজবুত মানে? পিঁপড়ে ঢোকার পথ নেই। এই তালা স্পেশ্যালি বানানো।"

অর্জুন মনে-মনে হাসল। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাংড়া-পাঁচুর কাছে কোনও তালাই কিছু নয়। তবে ভরসা এই যে, এখন শহরে ওর মতো প্রতিভা দ্বিতীয়টি নেই।

আগামীকাল সকালে দেখা করবে কথা দিয়ে অর্জুন বাইরে বেরিয়ে এসে ল্যাংড়া-পাঁচুকে পাঁচটা টাকা দিল, "যাও, রিকশা করে চলে যাও।"

"আপনি জানেন না এই সময় জলপাইগুড়িতে রিকশা পাওয়া যায় না।"

ঠিকই। রাত ন'টা মানে রিকশাওয়ালাদের কাছে মধ্যরাত। ল্যাংড়া-পাঁচু বলল, "আমি হেঁটেই যাব। আমার কথা ভুলবেন না বাবু।" পাঁচটা টাকা সে নিয়ে নিল।

মাথার ভেতরটা যেন লোহা হয়ে গেছে। কিছুই ভাবতে পারছিল না সে। বাইকে স্টার্ট দিতেই হঠাৎ মহাদেববাবুর কথা মনে পড়ল। মহাদেব সেন। অমলদার বন্ধু। বয়সে অবশ্য অনেক বড়। দীর্ঘদিন মহাকাশবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেছেন। এখন একটা চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাড়িতে চলে এসেছেন। খুব পণ্ডিত মানুষ। অর্জুনের মনে হল মহাদেববাবুর কাছে যাওয়া দরকার।

জলপাইগুড়ি শহরে সন্ধে নামতেই সেটা রাত হয়ে যায়। ন'টা বেজে গেলে রাস্তাগুলো খাঁ-খাঁ হয়ে যায়। নির্জন রাস্তায় দ্রুত বাইক চালাতে-চালাতে অর্জুনের একবার মনে হল এটা অসময়, মহাদেববাবু

ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। এখন যাওয়া মানে বিরক্ত করা। কিন্তু, একটু মরিয়া হল সে।

বাবুপাড়ায় করলা নদীর ধারে একটা গেটওয়ালা বাড়ির সামনে বাইক দাঁড় করিয়ে সে ভেতরে ঢুকল। বাইরেটা অন্ধকার কিন্তু ভেতরে আলো জ্বলছে। বেল টিপতেই মহিলা কণ্ঠে প্রশ্ন এল, "কে ?"

"আমি অর্জুন।"

মিনিটখানেকের মধ্যেই ওপরের বারান্দায় আলো জ্বলল। অর্জুন দেখল ষোলো-সতেরো বছরের একটি স্কার্ট-পরা মেয়ে ওপর থেকে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করছে। সে জিজ্ঞেস করল, "মহাদেববাবু কি জেগে আছেন ? একটু দরকারে এসেছিলাম।"

"আপনি— !" মেয়েটি ওপর থেকে নেমে আসা আলোয় অর্জুনকে চিনতে পেরে হঠাৎই উচ্ছ্বসিত হল, "ও আপনি ! না না, দাদু ঘুমোয়নি এখনও। দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান।" মেয়েটি অন্তর্হিত হল। অর্জুন বেশ অবাক। মেয়েটিকে সে আগে কোনওদিন দ্যাখেনি। অমলদার কাজে মহাদেববাবুর কাছে তাকে কয়েকবার আসতে হয়েছে এখানে।

মেয়েটি দরজা খুলল, "আমি তিস্তা। আপনার কথা খুব জানি।"

"ও।"

"আসুন।"

তিস্তার পেছনে সে দোতলায় উঠে এসে যে-ঘরটিতে ঢুকল সেখানেই মহাদেববাবু পড়াশোনা করেন। চোখের গোলমাল বেড়ে যাওয়ার পর অবশ্য সেটা বন্ধ হয়েছে। তাকে অপেক্ষা করতে বলে তিস্তা খবর দিতে গেল। মহাদেববাবু এলেন খানিক বাদেই। লুঙ্গির ওপর গেঞ্জি পরা, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কী খবর অর্জুনবাবু ?"

অর্জুন উঠে দাঁড়িয়েছিল চেয়ার ছেড়ে, "একটু বিরক্ত করলাম।"

"নট অ্যাট অল। আয় দিদু, এই হল আমার নাতনি। খুব গোয়েন্দা গল্প ভালবাসে। শুরু করেছিল এনিড ব্লাইটন, ক্যারোলিন কিন দিয়ে। এখন কোনান ডয়েল শেষ করে আগাথা ক্রিস্টি ধরেছে। থাকে কলকাতায়।" মহাদেববাবু নাতনির কাঁধে হাত রাখলেন।

তিস্তা বলে উঠল, "সত্যি, আপনি লন্ডন, নিউ ইয়র্কে গোয়েন্দাগিরি করেছেন ?"

মহাদেববাবু বললেন, "যা পড়েছ সব সত্যি। এখন যাও দিদু, আমরা একটু কথা বলি।" বেশ অনিচ্ছার সঙ্গে তিস্তা চলে গেলে মহাদেববাবু বসলেন, "তোমার দাদা তো আবার উধাও হয়েছেন। বেশ আছে সে। হিংসে হয়। ঈশ্বর আমার চোখ দুটো এমন না করলে কে থাকত এখানে পড়ে ? যাকগে, এত রাত্রে এসেছ যখন তখন নিশ্চয়ই কোনও প্রয়োজন

আছে !”

“হ্যাঁ আছে। কিন্তু তার আগে বলুন আপনি ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাস করেন ?”

“একটা কিছুর ওপর নির্ভর করলে মনে জোর পাওয়া যায়। এই পৃথিবীটার সবকিছু যে নিয়ম মেনে চলে তার পেছনে যদি কারও পরিকল্পনা না থাকত তা হলে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যেত। ঈশ্বর থাকার বিপক্ষে যত যুক্তি, থাকার পক্ষে অনেক বেশি যুক্তি দেওয়া যায়। আসলে তিনি আছেন ভাবতেই ভাল লাগে।”

অর্জুন মহাদেববাবুর চোখের দিকে তাকাল। মোটা কাচের আড়ালে চোখ দুটো অদ্ভুত বড়। সে জিজ্ঞেস করল, “আপনার চোখে কী হয়েছে ? ছানি পড়লে ...।”

মহাদেববাবু হাত নাড়লেন, “না ভাই। এটা ছানি নয়। গ্লুকোমা। আমার চোখের ভেতরের কিছু শিরা শুকিয়ে গেছে। চোখের ভেতরের প্রেশারও অ্যাবনর্মালি বেশি। এ-জীবনে সারবে না, বরং দিন-দিন আরও কম দেখতে পাব। এই সুন্দর পৃথিবীতে অন্ধ হয়ে বেঁচে থাকার কথা ভাবতে খুব কষ্ট হয়।”

মহাদেববাবুর মুখটাকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “অপারেশন করলে হয় না ?”

“হত। কিন্তু আমার যে আবার বেশিরকমের ব্লাড সুগার আছে। হত বলছিই বা কেন ! আমার যে স্টেজ তাতে নিশ্চয় করে কিছুই বলা যায় না। থাকগে। আমার কথা থাক। কী উদ্দেশ্যে এখন এলে তাই শোনা যাক।” মহাদেববাবু হাসার চেষ্টা করলেন।

অর্জুন বলল, “আমি একটু বিপাকে পড়েছি। অমলদা থাকলেও উনি আমাকে আপনার কাছে পাঠাতেন। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। আমি অন্তত আগে শুনিনি।”

মহাদেববাবু বললেন, “কে যেন লিখেছেন পৃথিবীর সব রহস্য কোথাও-না-কোথাও কেউ-না-কেউ সমাধান করে গেছেন। যেহেতু আমরা সেই সমাধানের সূত্র জানি না তাই এখনও আমাদের কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়। ব্যাপারটা শোনা যাক।”

অর্জুন থানায় সন্ধেবেলায় রামচন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে সমস্ত ঘটনা পর-পর বলে গেল। কম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষেরা কোনও কথা শোনার সময় অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করেন। মনে হয় নিজেদের শ্রবণেন্দ্রিয় ক্রমশ শক্তিশালী করাই তাঁদের চেষ্টা হয়ে থাকে। অর্জুন চুপ করলে মহাদেববাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কার্ভালো অসময়ে যাওয়ার সময় রামচন্দ্রবাবুকে কি কিছু বলে গিয়েছেন ?”

“বোধ হয় না। বললে উনি আমাকে বলতেন।”

"বোধ হয় ব্যাপারটা ঠিক নয়। তোমার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। কারণ যদি সুটকেসের বস্তুটা সম্পর্কে কিছু জানিয়ে গিয়ে থাকে, ধরো, কোত্থেকে তিনি ওটাকে পেলেন, তাঁর কিছু হয়েছে কি না, তা হলে একটা ধারণা স্পষ্ট হত।"

"আমি জিজ্ঞেস করিনি। তবে জানা থাকলে রামচন্দ্রবাবু নিশ্চয়ই বলতেন।"

"কার্ভালো ওঁর বাড়িতে এক রাত ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"তখন কার্ভালোকে কেউ মিডিয়াম হিসেবে ব্যবহার করেনি?"

"এই প্রশ্নটাও আমি করিনি।"

"রামচন্দ্রবাবু সিগন্যাল না কী যেন শুনতে পাচ্ছিলেন, তুমি পাওনি?"

"না।"

"তোমার সঙ্গে যে-লোকটা তালা ভাঙতে গিয়েছিল সে পেয়েছে?"

"না। পেলে বলত।"

"যন্ত্রটাকে একবার না দেখলে কিছু বলা যাচ্ছে না। এমন হতে পারে, এ-সবই রামচন্দ্রবাবুর কল্পনা। আজ রাত্রে থানায় ওটা রেখে এসেছ। যদি ওটা সক্রিয় থাকে তা হলে থানার কোনও চোর অথবা পুলিশের অবস্থা রামচন্দ্রবাবুর মতো হবে। অতএব আগামীকাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।" মহাদেববাবু বললেন।

"আচ্ছা, যন্ত্র বলেই বলছি, মহাকাশের সঙ্গে জড়িত কিছু নয় তো?"

"মহাকাশে তো কোনও যন্ত্র এমনি ঘুরে বেড়ায় না যে খসে পড়লে পৃথিবীর কোনও মানুষ কুড়িয়ে পাবে! আর যদি বা পড়ে তা হলে পৃথিবীতে পড়তে যাবে কোন দুঃখে! যদি পৃথিবীতেও পড়ে তো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "তা হলে কাল সকালে থানায় গিয়ে খোঁজ নেব।"

"দাঁড়াও।" মহাদেববাবু হাত তুললেন, "তুমি বললে রাত হলে রামচন্দ্রবাবু যে সিগন্যালটা শোনেন, তা ওই যন্ত্রের মধ্যে মিলিয়ে যায়। তখন তাঁর আর হুঁশ থাকে না। যা উনি করেন তা তাঁকে দিয়ে অন্য কেউ করায়?"

"হ্যাঁ। উনি তো তাই বলেছেন।"

"তোমার সঙ্গে তো বাইক আছে?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু বাইকে বসার সাহস আমার নেই। নইলে তোমার সঙ্গে গিয়ে রামচন্দ্রবাবুকে এই রাত্রে দেখে আসতাম। বেশি রাত তো হয়নি!"

"আপনি যদি আমার পেছনে বসেন তা হলে আমি খুব সাবধানে

চালাতে পারি।”

“না, তুমি একটা রিকশা ডাকো।”

মহাদেববাবু যে অত রাত্রে অর্জুনের হাত ধরে বের হচ্ছেন, তা ওঁর বাড়ির লোকদের পছন্দ ছিল না। অনেকেই মুখের ওপরেই আপত্তি জানালেন। তিস্তা বায়না ধরল সে সঙ্গে যাবে, কিন্তু মহাদেববাবু কারও কথা কানে তুললেন না।

তিনি যখন তৈরি হচ্ছিলেন, তখন অর্জুন জলপাইগুড়ির রাত্রের রাস্তায় রিকশা খুঁজছিল। যেহেতু ন'টা বেজে গেছে, একটাও রিকশা চোখে পড়ছিল না। সে খুব হতাশ হয়ে মহাদেববাবুর গেটের সামনে ফিরে আসতেই শুনল বৃদ্ধ বলছেন, “কে?”

“আমি অর্জুন।”

“ও, রিকশা পেলে না?”

“না।”

“রাজবাড়ি তো বেশি দূর নয়, চলো হেঁটেই যাই।”

“অন্তত দেড় কিলোমিটার পথ।”

“এমন কী বেশি? তোমার বাইকের চেয়ে হাঁটতে আরাম হবে বেশি।”

নির্জন জলপাইগুড়ির রাস্তায় হাঁটতে ভাল লাগছিল না অর্জুনের। নিজের বাইকটাকে সে মহাদেববাবুর বাড়ির গেটের ভেতরে ঢুকিয়ে রেখে এসেছিল। মহাদেববাবু হঠাৎ বললেন, “জানো, আমাদের বাংলা ভাষায় মহাকাশ নিয়েও গল্প-উপন্যাস লেখা হচ্ছে। কিন্তু সেদিন একটা কাহিনী শুনলাম, যা আমাকে খুব চমকে দিয়েছে।”

মহাদেববাবু যে আন্দাজে হাঁটছেন, তা বুঝতে পেরেই অর্জুন তাঁর হাত ধরল। দু'পাশে বাড়ি-ঘর-দোকানের আলো নিভে গেছে। মাঝে-মাঝে দু-একটা রিকশা দেখা গেলেও তারা যাত্রী নিয়ে পাঁই-পাঁই করে ছুটছে। হাঁটতে-হাঁটতে মহাদেববাবু গল্পটা শোনালেন। এক ভদ্রলোকের হার্ট ব্লক হয়েছিল। কিন্তু তাঁর শরীরের যা অবস্থা তাতে অপারেশন করা সম্ভব ছিল না। অনেক ভাবনাচিন্তার পর সার্জেন এবং তাঁর সহকারী নিজেদের শরীরে যে ইনজেকশন নিলেন তাতে তাঁদের শরীর ছোট হয়ে গেল। একটা ছোট্ট ক্যাপসুলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন তাঁরা। তারপর সেই ক্যাপসুলটাকে ইঞ্জেকশনের সাহায্যে ভদ্রলোকের ধমনীতে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ধরা যাক, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যা করার করতে হবে সার্জেনকে। তারপরে ওই ক্যাপসুল গলে যাবে।”

এই পর্যন্ত বলে মহাদেববাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কী, আজগুবি বলে মনে হচ্ছে?”

“একটু।”

"লেখক সামান্য লাইসেন্স নিয়েছেন। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে লোকে চাঁদে হেঁটে বেড়ানোটাকে আজগুবি বলে মনে করত।"

"তারপর?" হাঁটতে-হাঁটতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"ধমনী বেয়ে ক্যাপসুলে চেপে লোক দুটো পথ হারিয়ে ফেলল। ওরা প্রথমে গেল স্টম্যাকে। তারপর লিভারে। নানা জায়গা ঘুরে ওরা যখন হার্টে পৌঁছল তখন অনেক নাটক হয়ে গেছে। কিন্তু হাতে সময় নেই। শিরা বেয়ে ওরা হৃদযন্ত্রে প্রবেশ করল। খুদে-খুদে যন্ত্রপাতির সাহায্যে ওরা অপারেশনের পুরো কাজটা শেষ করল। হাতে বেশি সময় নেই কিন্তু বেরিয়ে আসার পথ ওরা খুঁজে পাচ্ছিল না। কী করে ওরা বের হল বলতে পার?" মহাদেববাবু প্রশ্ন করলেন।

অর্জুন ভেবে পেল না। ওরা তখন রাজবাড়ির গেট পেরিয়ে যাচ্ছে। মহাদেববাবু বললেন, "পেশেন্টের চোখের জলের সঙ্গে ওদের ক্যাপসুল বেরিয়ে আসামাত্র গলে গেল। বেরোবার ওই একটিমাত্র পথ ছিল। দারুণ গল্প। পড়তে-পড়তে শিরদাঁড়া সোজা হয়ে যায়।

অর্জুন বলল, "এই বাড়ি।"

রামচন্দ্র রায়ের বাড়ির সদর দরজা বন্ধ। জানলাগুলোও। কিন্তু ভেতরে আলো জ্বলছে। অর্জুন কড়া নাড়ল। ভেতর থেকে কোনও শব্দ ভেসে এল না। দ্বিতীয়বারের পর গলা পাওয়া গেল। অর্জুন নিজের পরিচয় দেওয়ার পর দরজাটা খুলল। খালি গায়ে লুঙ্গি পরে রামচন্দ্র রায় তাদের দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছেন। যেন তাঁর বুঝতে সময় লাগল। শেষমেশ বললেন, "ও, আমি ভাবলাম, আসুন-আসুন। আমি শুয়ে পড়েছিলাম।" কথাগুলো বেশ জড়ানো।

অর্জুন বলল, "আমি খুবই দুঃখিত যে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে—।"

হাত নাড়লেন রামচন্দ্রবাবু, "ঘুমোইনি। কিছুতেই ঘুম আসছিল না। শুয়ে ছিলাম।"

"প্রতি রাত্রে যা হয় আজ সেসব—।"

"হয়নি। এমনকী সেই সিগন্যালিং সাউন্ডটাও কানের পরদা থেকে উধাও। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল কিছু একটা হবে, কিন্তু হচ্ছে না। টেনশন বাড়ছে কিন্তু ঘুম আসছে না।"

"আপনি তো তাই চেয়েছিলেন।"

"মোটেই নয়। ওরা আমাকে দিয়ে কোনও অপরাধ করাক এটা চাইনি। কিন্তু আমার কাছ থেকে চলে যাক, এটা কখনও ভাবিনি। সুটকেসটাকে কোথায় রেখেছেন?"

এবার মহাদেববাবু কথা বললেন, "নমস্কার। আমার নাম মহাদেব সেন। চোখে দেখি না বলাই সঙ্গত। অর্জুনবাবুর সঙ্গে তবু এলাম। আপনার মনে হচ্ছে সুটকেসটা এখানে থাকলে সুবিধে হত?"

রামচন্দ্র রায় বললেন, "নিশ্চয়ই। কার্ভালো যে আমার এত বড় উপকার করেছে তা আগে বুঝিনি। ওর ওই সুটকেসটার জন্যেই রোজ রাত্রে ওরা এই বাড়িতে আসত।"

"কারা?" মহাদেব সেন জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি জানি না। কিন্তু ওদের উপস্থিতি টের পেতাম। বেশ ভাল লাগত।"

এবার অর্জুন বলল, "ভাল লাগত? আপনি আগে একবারও বলেছেন এ কথা? থানায় গিয়েছিলেন এর বিরুদ্ধে ডায়েরি করতে, তা হলে কী করে ভাল লাগত?"

"আঃ, বোঝাতে পারিছি না, ওদের উপস্থিতি আমার ভাল লাগত কিন্তু ওরা যদি আমাকে দিয়ে অন্যায় কিছু করিয়ে নেয় তাই ভয় করত। সুটকেসটা কোথায়?" রামচন্দ্র রায় বেশ উদ্বিগ্ন।

"ওটা ঠিক জায়গায় আছে। আমরা আপনার সঙ্গে ওই ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি। একটু বসতে পারি? উনি অনেকটা পথ হেঁটে এসেছেন।" অর্জুন বলল।

বোঝা গেল অনিচ্ছা প্রবল, তবু বসতে বললেন রামচন্দ্র রায়। বসাটা দরকার ছিল মহাদেববাবুর। তিনি একটু আরামসূচক শব্দ করে জিজ্ঞেস করলেন, "সুটকেসটা যে এত জরুরি তা আপনি আগে জানতেন?"

"না। ওটা পড়ে থাকত ঘরের কোণে।"

"আপনার বন্ধু আপনাকে দিয়েছিল?"

"দেয়নি। রেখে গিয়েছিল। বলেছিল অসম থেকে ফেরার পথে নিয়ে যাবে।"

"যে-রাত্রে তিনি এ-বাড়িতে ছিলেন সেই রাত্রে কোনও ঘটনা ঘটেছিল? মানে, ওই সিগন্যালিং সাউন্ড? কারও আসার অনুভূতি।" মহাদেববাবু প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন।

"না। একদম হয়নি। কার্ভালো চলে যাওয়ার পরের রাত থেকে এটা শুরু হয়েছে।"

"যাওয়ার দিন উনি কি সুটকেস খুলেছিলেন?"

রামচন্দ্রবাবু মনে করার চেষ্টা করলেন। তারপর মাথা দোলালেন, "হ্যাঁ। কেউ নিজের সুটকেস খুলছে তা মুখ বাড়িয়ে দেখা অভদ্রতা। আমি দেখিনি।"

"কার্ভালো আপনাকে যন্ত্রটা সম্পর্কে কিছু বলে গিয়েছেন?"

"না।"

"মিস্টার রায়, এখন কি মনে হচ্ছে আপনি রোজ রাত্রে একটা নেশার মধ্যে ছিলেন, কিন্তু এখন সেই নেশার বস্তুটি পাচ্ছেন না?"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমার ঘুম আসছে না।"

"যারা আপনার কাছে আসে বলে মনে হয়, তাদের কোনও কথা আপনার মনে আছে ?"

"তারা কোনও কথা বলে না।"

মহাদেব সেন এবার উঠে দাঁড়ালেন, "চলি, অনেকটা পথ ফিরতে হবে।"

রামচন্দ্র রায় বললেন, "কিন্তু সুটকেসটাকে আমার চাই, এখনই।"

"এখনই দেওয়া সম্ভব নয়।" অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

"কেন ?"

"ওটাকে থানার সিন্দুকে রেখে এসেছি। কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।" সঙ্গে-সঙ্গে ভদ্রলোক ভেঙে পড়লেন, "ওঃ, কী দুর্মতি হয়েছিল ! থানায় গিয়ে আমার কাল হল। ওঃ।"

মহাদেব সেনের হাত ধরে অর্জুন বেরিয়ে আসতেই লটারির মতো একটা রিকশা পেয়ে গেল। রোড স্টেশনে তার রিকশা খারাপ হয়ে যাওয়ায় এত রাত পর্যন্ত আটকে পড়ে ছিল। মহাদেব সেন আর অর্জুন সেই রিকশায় বসে শহরের দিকে হু-হু করে চলে আসছিল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কিছু বুঝলেন ?"

"এক বিন্দু নয়। বুঝবে তুমি। আমার কাজ প্রশ্ন করে যাওয়া। আমরা কি থানার রাস্তায় যাচ্ছি ?"

"থানা ? আপনি এখন বাড়িতে ফিরবেন না ?"

"নিশ্চয়ই। তবে তার আগে একবার থানার ব্যাপারটা শুনে যেতে চাই।"

"বুঝলাম না।"

"রাত অনেক হয়েছে। থানার লোকজন সিগন্যালিং সাউন্ড শুনতে পাচ্ছে কি না অথবা ওদের কারও রামচন্দ্র রায়ের মতো অবস্থা হল কি না। এটা জানা দরকার।"

অর্জুন রিকশাওয়ালাকে থানার দিকে যেতে বলল। লোকটা আপত্তি করল। ওর বাড়ি থানা থেকে অনেক দূরে। সে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে না।

থানায় পৌঁছে মহাদেব যেন নামতে চাইলেন না। তিনি রিকশায় বসে রইলেন। অর্জুন নামল। পাহারায় থাকা সেপাই জানাল অবনীবাবু ফিরেছেন। তিনি এখন নিজের কোয়ার্টার্সে আছেন। সেকেন্ড অফিসার শঙ্করবাবু এত রাত্রে অর্জুনকে দেখে অবাক, "কী হল মশাই ?"

"কিছুই হয়নি। আপনাদের নতুন কোনও খবর আছে ?"

"পুলিশের আবার নতুন খবর ! সবসময়ই খবর। কী ব্যাপার বলুন তো ?"

"একবার ভল্টের সামনে নিয়ে যাবেন ?"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু রহস্য কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে !"

অর্জুন আর কথা না বাড়িয়ে শঙ্করবাবুকে অনুসরণ করল। ভল্টের দরজায় তেমনই তালা ঝুলছে। সে জিজ্ঞেস করল, "এখানে যারা আছে তাদের আচরণে কোনও পরিবর্তন এসেছে ?"

"না। আর পরিবর্তন হবেই বা কেন ?"

"একটা কারণ ছিল। কেউ কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছে ? মেটালিক টোন ?"

"আমি তো শুনিনি। কেউ শুনলে নিশ্চয়ই বলত। আপনি শুনছেন ?"

অর্জুন হেসে ফেলল, "নাঃ। চলুন।"

"কী ব্যাপার ! এসব প্রশ্ন করছেন কেন ?"

"যে ভদ্রলোকের কাছে সুটকেসটা ছিল তিনি শুনতে পেতেন।"

"লোকটা নিশ্চয়ই নেশাভাঙ করত ! জলপাইগুড়িতে এরকম লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। আরে মশাই এক ভদ্রমহিলা রোজ রাতে ভূত দেখছেন। গিয়ে জানলাম একটা মাটির প্যাঁচা মেলা থেকে কেনার পর থেকেই নাকি ওই কাণ্ড শুরু হয়েছে। বললাম, ভেঙে ফেলুন কিন্তু তা করবে না। জোর করে সেটাকে করালাম, ফেলে দিতে ভূত দেখা বন্ধ হল। বুঝুন। কিসে এলেন, বাইক কোথায় ?"

"রিকশায় এসেছি। সঙ্গে একজন বিশিষ্ট মানুষ আছেন।"

"কে ?"

"মহাদেব সেন।"

"শঙ্করবাবু সম্ভবত মহাদেব সেন সম্পর্কে বেশি কিছু জানেন না। কিন্তু তিনি অর্জুনের সঙ্গে গেট পর্যন্ত এলেন। দূর থেকেই রাস্তার আলোয় অর্জুনের চোখে পড়ল রিকশার ওপরে মহাদেব সেন দু' হাতে কান চেপে বসে আছেন। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে নাকি ভদ্রলোকের ! নিজেকে অপরাধী বলে মনে হল। এত রাত্রে ওঁকে বিব্রত করা ঠিক হয়নি। কাছে পৌঁছে সে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ?"

অদ্ভুত চোখ করল মহাদেব সেন, "অর্জুন, আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমার কানের পরদায় একটানা একটা সাউন্ড বিপবিপ করে বেজে যাচ্ছে। কখনও রেডিয়ো খোলার আগের শব্দের মতো টানা। মাই গড। তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ ?"

হতভম্ব অর্জুন বলল, "না।"

"এই রিকশাওয়ালাটাও পাচ্ছে না। আপনি পাচ্ছেন ভাই ?"

শঙ্করবাবু হাঁ হয়ে শুনছিলেন। মুখ বন্ধ করে দ্রুত মাথা নেড়ে না বললেন। সেটা ভাল করে দেখতে পেলেন না মহাদেব সেন। বুঝতে

পেরে অর্জুন বলল, "উনিও কিছু শুনতে পাচ্ছেন না।"

মহাদেব সেনকে খুবই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। অর্জুন বলল, "ঠিক আছে। চলুন, বাড়িতে গিয়ে রেস্ট নেবেন।"

মাথা নাড়লেন মহাদেব সেন, " না ভাই। মিস্টার রায় যা বলেছিলেন অবিকল সেই আওয়াজ। খুব দূর থেকে আসছে, যেন ক্ষীণ কিন্তু কানে পৌঁছে যাচ্ছে। রিকশাটা এখানে দাঁড়ানো মাত্র ওটা কানে পৌঁছেছে। ব্যাপারটা আমার দেখা উচিত।"

শঙ্করবাবু বললেন, "সার, আপনি বোধ হয় ঠিক সুস্থ নন।"

"রাবিশ। চোখে দেখতে না পাওয়া ছাড়া আমার কোনও প্রব্লেম নেই।" মহাদেব সেন রিকশা থেকে নামার চেষ্টা করছেন দেখে অর্জুন এগিয়ে গিয়ে তাঁকে ধরল। মহাদেব সেন মাটিতে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমাকে থানার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলো।"

রিকশাওয়ালা এতক্ষণ এসব কাণ্ড দেখছিল। এবার বলল তাকে ছেড়ে দিতে। এমনিতেই প্রচুর রাত হয়ে গিয়েছে, তার ওপর ভুতুড়ে ব্যাপারে সে নেই। অর্জুনের আপত্তি ছিল, কিন্তু শঙ্করবাবু বললেন, "এখানে এসে পড়েছেন যখন, তখন কোনও প্রব্লেম নেই। গাড়ি করে ওঁকে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে মহাদেব সেনের পাশে এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, "অর্জুনবাবু।"

"হ্যাঁ, বলুন।"

"মনে করে দ্যাখো তো, তোমার সঙ্গে কথা বলতে মিস্টার রায় এরকম শব্দ শুনতে পেয়েছেন কি না?"

"হ্যাঁ। উনি পাচ্ছিলেন।"

"গুড। এখনও আমার বোধবুদ্ধি ঠিক আছে। মিস্টার রায় তোমাকে বলেছেন একটা সময় তাঁর কোনও হুঁশ থাকত না। সেই অবস্থা যদি আমার হয় তা হলে একটু লক্ষ্য রেখো। আমি চেষ্টা করব আমার হুঁশ ঠিক রাখতে। সুটকেসটাকে কোথায় রেখেছ?" মহাদেব সেনের চোখ এখন একেবারেই বন্ধ। কিন্তু মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল ওঁর ভেতরে কিছু ঘটে যাচ্ছে।

"মাটির তলার ঘরে।" অর্জুন জবাব দিল।

"আমাকে সেখানে নিয়ে চলো।"

"আমি তো নিয়ে যেতে পারব না। জায়গাটায় বাইরের মানুষের যাওয়া নিষেধ যদি না এঁরা অনুমতি দেন। শঙ্করবাবু, উনি একবার ভল্টের সামনে যেতে চান। নিয়ে যাবেন?"

অর্জুন প্রশ্ন করতে শঙ্করবাবু তার দিকে মুখ ফেরালেন। তাঁর চোখে-মুখে বিস্ময়। মহাদেব সেনের ওই পরিবর্তনের কারণ তিনি বুঝতে

পারছেন না। থানায় যারা পাহারা দিচ্ছিল সেই সেপাইরাও কাছাকাছি এসে যেন মজা দেখছে।

শঙ্করবাবু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করবেন, "কী ব্যাপার ? ভূতে ভর করছে নাকি ?"

কথাটা চাপাস্বরে হলেও মহাদেব সেনের কানে গেল। তাঁর গলা শোনা গেল, "অর্জুন, ওর কথাগুলো শুনতে পেয়েছি। তার মানে আই অ্যাম ইন ফুল সেন্স। ভূতে ভর করলে এসব কথা বলতে পারতাম না মশাই। ঠিক কি না ?"

শঙ্করবাবু চটপট বলে উঠলেন, "ঠিক কথা। অর্জুনবাবু, আমি একবার বড়সাহেবকে জিজ্ঞেস করে আসি। যদি কিছু হয়ে যায়, মানে, আমার একটু ঝুঁকি থাকছে তো !"

অর্জুন বলল, "এত রাত্রে ভদ্রলোককে ঘুম থেকে তুলবেন ? আমরা তো কিছুই করছি না। শুধু দরজা পর্যন্ত যাচ্ছি আর ফিরে আসছি।"

শঙ্করবাবু আর একটু ইতস্তত করে বললেন, "ঠিক আছে, তবে অন্য কিছু হলে আপনি কিন্তু আমার কথা বড়সাহেবকে বলবেন। আমি অবশ্য ওঁকে বলেছি যে, আপনি এসে একটা সুটকেস রেখে গেছেন। উনি জিজ্ঞেস করলেন, কিসের সুটকেস ? আমি বললাম সম্ভবত দামি জিনিস আছে ভেতরে।"

"তা হলে তো ওঁকে জানানোই হয়ে গেছে। চলুন, আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।"

ওরা যত এগোচ্ছিল তত নিচুস্বরে মহাদেব সেন বলছিলেন, "খুব জোরে বাজছে হে। রায় ঠিকই বলেছে। কোনও আজগুবি ভূতপ্রেত নয়। একেবারে মাথার ভেতরে হ্যামার করছে।"

বন্ধ দরজার সামনে ওরা যখন এসে দাঁড়াল, তখন মহাদেব সেনের মুখ-চোখ বেশ উত্তেজিত। অর্জুন বলল, "ওই ঘরের ভেতরে সুটকেসটা আছে।"

মহাদেব সেন সজোরে দরজায় ঘুসি মারলেন।

শঙ্করবাবু বলে উঠলেন, "করছেন কী ? তালা দেওয়া আছে। কাল সকালের আগে খোলা যাবে না। আরে, আপনার হাতে লাগবে ! ও অর্জুনবাবু, সামলান ওঁকে।"

অর্জুন মহাদেব সেনের হাত ধরল, "আপনি আহত হবেন।"

"হই হব। আই মাস্ট সি দ্যাট সুটকেস। আঃ কী আরাম।" কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছিল ওঁর। চোখ-মুখ পালটে যাচ্ছিল। শঙ্করবাবুর ইঙ্গিতে পাহারাদাররা ছুটে এসে মহাদেব সেনকে জড়িয়ে ধরল। একজন একটা দড়ি এনে ভাল করে বাঁধতে যাচ্ছিল, কিন্তু অর্জুন তাকে বাধা দিল। "না। ওটা করবেন না। ধরাধরি করে ওঁকে বরং বাইরে নিয়ে

চলুন।”

ওরা যখন মহাদেব সেনকে জোর করে তুলে ওপরে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন শঙ্করবাবু ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “সুটকেসটার ভেতরে ভূত আছে নাকি ? অ্যাঁ। ভদ্রলোকের ওপর তো ভর করে ফেলেছে।”

“আপনি তো ওসবে বিশ্বাস করেন না।”

“করতাম না। কিন্তু এখন চোখের ওপর দেখছি।”

ওপরে এসেও সেপাইরা মহাদেব সেনকে সামলাতে পারছিল না। তিনি যেন প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী এখন। সেপাইরা কী করবে বুঝতে পারছে না। অর্জুন ওঁকে বোঝাতে গেল, “আপনি শান্ত হোন, কী করছেন ?”

মহাদেব সেন এমন সব শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন, যা অর্জুন এই জীবনে শোনেনি । এমনিতে দৃষ্টিশক্তি প্রায় নেই, কিন্তু এখন তাঁকে দেখে ওসব মনেই আসছে না। চিৎকার চেঁচামেচিতে অবনীবাবুর ঘুমও ভেঙে গেল। তিনি নেমে এলে অর্জুন তাঁকে সব জানাল। ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে অবনীবাবু নিজে একবার ভল্টের দরজা থেকে ঘুরে এলেন, তাঁর আচার-আচরণে কোনও পরিবর্তন হল না। ওপরে এসেই অবনীবাবু মহাদেব সেনের বাড়িতে একজন সেপাইকে পাঠালেন খবর দিতে, আর টেলিফোনে ডাক্তার দাসকে থানায় আসতে বললেন।

দুটো হাত পেছন দিকে শক্ত করে ধরে মহাদেব সেনকে একটা চেয়ারে জোর করে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। অর্জুনের খুব কষ্ট হচ্ছিল। এই বৃদ্ধ অসুস্থ মানুষটিকে সে কোন্ সমস্যায় জড়িয়ে দিল !

মিনিট কুড়ির মধ্যে প্রায় একই সঙ্গে মহাদেব সেনের ছেলে এবং বউমা আর ডাক্তার দাস এসে গেলেন। মহাদেব সেনের ছেলে সুব্রত সেন এখানকার কলেজের অধ্যাপক। বাবার ওই অবস্থা দেখে তিনি অবাক !

কী করে এমন হল প্রশ্ন করাতে অর্জুন খুব দুঃখের সঙ্গে ব্যাপারটা জানাল। ভদ্রলোক বললেন, “খুব অন্যায় করেছেন বাবাকে অত রাত্রে নিয়ে গিয়ে। এই বয়সে এ কী হয়ে গেল বলুন তো !”

সুব্রত সেনের স্ত্রী অনেকটা বাস্তব কথা বললেন, “বাবা না চাইলে কেউ কি ওঁকে নিয়ে যেতে পারে ? তা ছাড়া উনি কী করে জানবেন যে, এমন হবে !”

ডাক্তার দাসকে মহাদেব সেন পরীক্ষা করতে দিলেনই না। যতবার তিনি কাছে যাচ্ছেন ততবার যেন তাঁর ওপরেই আক্রোশ পড়ছে। শেষপর্যন্ত ডাক্তার দাস বললেন, “মনে হচ্ছে কোনও কারণে ওর নার্ভাস সিস্টেমে গোলমাল হয়েছে। এখনই কড়া ঘুমের ওষুধ দেওয়া উচিত। আপনারা জোর করে ধরুন, আমি একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে দিচ্ছি।”

তাই করা হল। মহাদেব সেনের শরীরে প্রচণ্ড শক্তি, এখন তবু সবাই মিলে জোর করে তাঁকে এমনভাবে ধরা হল যাতে ডাক্তার দাস ইনজেকশন দিতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্য, তাতেও কাজ হল না। ভদ্রলোকও রীতিমত অবাক। বললেন, "কোনও মানুষ এই ইনজেকশনের পর মিনিট পাঁচেক জেগে থাকতে পারে না। এঁর কী হল ?"

রাতটা ওইভাবেই কাটল। ভোর যত এগিয়ে এল, তত নেতিয়ে পড়তে লাগলেন মহাদেব সেন। সূর্য ওঠার ঠিক আগে তিনি একদম শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর মুখ-চোখ শান্ত হয়ে এল। অবনীবাবু বললেন, "এখন ওঁকে বাড়িতে নিয়ে গেলে ঘুম ভেঙে যেতে পারে। এই ঘরেই আমি বিছানা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। শঙ্করবাবু, আপনি দেখবেন কেউ যেন এখানে না ঢোকে। মহাদেব সেনের মতো নামী বিজ্ঞানীর কোনও ক্ষতি হোক আমরা চাই না।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। মহাদেব সেন এখন আরামে ঘুমোচ্ছেন। ডাক্তার দাস পরীক্ষা করে দেখলেন, ওঁর পাল্‌স এবং হার্ট নর্মাল। ভয়ের কোনও কারণ নেই। ঘুমের স্তর পরীক্ষা করে ভদ্রলোক শুধু বললেন, "আশ্চর্য! মনে হচ্ছে আমি এইমাত্র ইনজেকশন দিয়েছি। কী কাণ্ড !"

মিসেস সেন চলে গেলেন। বললেন, "কাউকে পাঠিয়ে দিলে তুমি যেয়ো।"

সুব্রত সেন মাথা নাড়লেন। তাঁকে তখনও অর্জুনের ওপর সদয় মনে হচ্ছিল না।

অবনীবাবু বললেন, "চলুন, দরজা ভেজিয়ে আমরা বাইরে যাই। অর্জুনবাবু, অনেক ঝড় গেল, আপনি বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করুন।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "অসম্ভব। আমার জন্যে ওঁর এই দশা, উনি যতক্ষণ না সুস্থ হয়ে কথা বলছেন ততক্ষণ আমার ঘুম আসবে না।"

"বেশ, তা হলে চলুন, আমরা একটু চা-পান করি।"

ওরা দরজা ভেজিয়ে বাইরে এল। অবনীবাবু একজনকে ডেকে চায়ের কথা বললেন। সবে ভোর হচ্ছে। হঠাৎ অর্জুনের নজরে এল থানার গেট পেরিয়ে রামচন্দ্র রায় বেশ ইতস্তত ভাব নিয়ে ঢুকছেন। এই সময়ে ওঁকে এখানে দেখবে ভাবেনি সে। রামচন্দ্র রায় অর্জুনকে দেখতে পেয়ে ইশারায় ডাকলেন। অবনীবাবু বললেন, "আরে, এই ভদ্রলোকই তো গতকাল সন্ধেবেলায় আমার কাছে এসেছিলেন, তাই না অর্জুনবাবু ?"

"হ্যাঁ, উনিই। দাঁড়ান, দেখি কেন ডাকছেন !" অর্জুন এগিয়ে গেল।

রামচন্দ্র রায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। অর্জুন কাছে গিয়ে বলল, "সুপ্রভাত !"

"ও, হ্যাঁ, সুপ্রভাত।" ভদ্রলোককে আজ আরও বয়স্ক দেখাচ্ছিল।

"কী ব্যাপার?"

"আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম কাল রাত্রে নাকি ফেরেননি।"

এখন মা বাড়িতে নেই। ক'দিনের জন্যে এক পিসির বাড়িতে গিয়েছিলেন। কাজের লোকটি নিশ্চয়ই চিন্তা করবে না। অর্জুন গতরাত্রে বাড়িতে খবর দেয়নি সেই কারণেই।

"হঠাৎ কোনও প্রয়োজন হয়েছিল?"

"হ্যাঁ। আমার সুটকেসটা ফেরত দিন।"

"আপনি বলেছেন ওটা কার্ভালোর।"

"কার্ভালো আমার বন্ধু। সে ওটা আমার কাছে রেখে গিয়েছিল। অতএব ওর সম্বন্ধে যাবতীয় দায়িত্ব আমার। দয়া করে ফেরত দিন।" প্রায় মিনতি করলেন রামচন্দ্র রায়।

"দেখুন, ওটার অস্তিত্ব আছে তাই আমরা জানতাম না। আপনি নিজে এসে থানায় কথা না বললে এসব কিছুই হত না। কিন্তু নিজের অজান্তে আপনি একটা ভাল কাজ করেছেন। আপনার কাছে সুটকেসের ভেতরে যে যন্ত্রটি ছিল তার রি-অ্যাকশন সব মানুষের ওপর পড়ে না। আমি ল্যাংড়া-পাঁচু, থানার অফিসার অথবা সেপাইরা ওর রি-অ্যাকশন থেকে মুক্ত, অথচ কাল যে-ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আপনার বাড়িতে গিয়েছিলেন, তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। সারারাত ওঁর যে কষ্ট হয়েছে, তা আমি দেখেছি। মনে হয় আপনারও একই কষ্ট হত। এখন ওই যন্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত আমরা আপনাকে ফেরত দিতে পারি না," অর্জুন বলল।

অবনীবাবু ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার বন্ধু ওই যন্ত্র কোথায় পেয়েছেন তা কি আপনাকে বলেছেন?"

নীরবে মাথা নেড়ে না বললেন রামচন্দ্রবাবু।

"একটা অদ্ভুত জিনিস বেআইনিভাবে আপনি রাখতে পারেন না!"

রামচন্দ্রবাবুর কানে এসব কথা যাচ্ছিল না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের কারও কিছু হয়নি আর সেই ভদ্রলোকের অবস্থা আমার মতো হয়ে গেল! একবার তাঁকে দেখতে পারি?"

"উনি এখন ঘুমোচ্ছেন!" অবনীবাবু বললেন।

"আচ্ছা, আমিও সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মড়ার মতো ঘুমোতাম। আপনারা আমার সর্বনাশ করেছেন। এই ক'দিন বাতের ব্যথাটা ছিল না একটুও, আজ আবার ফিরে এসেছে। ওটা না পেলে আমি আজ আত্মহত্যা করব!" রামচন্দ্র রায় চাপা গলায় বললেন।

অর্জুন বৃদ্ধকে বলল, "ওই সিগন্যাল শোনা, ঘোরের মধ্যে থাকা

আপনার নেশা হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। একটা রাত না পেয়ে আপনি এসব কথাও ভাবতে পারছেন। অথচ আপনি নাবিক ছিলেন, কত কষ্ট, পরিশ্রম করেছেন, জীবন দেখেছেন। একটা সাধারণ নেশাখোরের কথা আপনার মুখে কি মানায় ?"

"ওঃ, কী করে বোঝাব ওটা কী ধরনের নেশা !"

"আপনি তো ওই নেশায় আক্রান্ত হয়ে কাউকে খুন করতে পারতেন !"

"হ্যাঁ, ঠিক, সব ঠিক।" রামচন্দ্র রায় মাথা নাড়লেন, "তবু— ।"

"আর কোনও তবু নয়। আমরা পরীক্ষা করে দেখতে চাই যন্ত্রটাকে। দরকার হলে সরকারকে জানাতে হবে। এরকম হচ্ছে কেন ! চিংড়িমাছ খেলে সবার ভাল লাগে, আবার কারও-কারও শরীরে এমন অ্যালার্জি বের হয় যে, সে দ্বিতীয়বার খায় না। তার শরীরের গঠনের সঙ্গে ওই মাছ মেলে না। মনে হচ্ছে আপনার বন্ধুর দেওয়া ওই যন্ত্রটি সব মানুষকে আক্রমণ করে না। কোনও-কোনও মানুষের মস্তিষ্কে এমন কিছু কোষ আছে, যা ওর পছন্দ। বোঝাই যাচ্ছে তাঁদের সংখ্যা খুব অল্প। আপাতত আপনি আর মহাদেববাবু একই গোত্রের। এখন আপনি বাড়ি ফিরে যান। মহাদেববাবুর ঘুম ভাঙলে মনে হয় কিছু জানা যেতে পারে।" অর্জুন তার লাল বাইকটির কথা ভাবল। সেটা মহাদেব সেনের বাড়ির সামনেই পড়ে আছে গত রাত থেকে। সে অবনীবাবুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাঁটা শুরু করল। সমস্ত রাত অদ্ভুত টেনশনে কাটিয়ে এখন বেশ অবসন্ন মনে হচ্ছে নিজেকে।

ঘুম হয়েছিল কি হয়নি, ঘণ্টা তিনেক বিছানায় শুয়ে স্নান সেরে কিছু মুখে দিয়ে অর্জুন যখন থানায় ফিরে এল, তখন ঘড়িতে সাড়ে দশটা। শঙ্করবাবু তাঁর বাসস্থানে এখনও ঘুমোচ্ছেন, অবনীবাবু এস. পি'র বাংলোয় গিয়েছেন। অর্জুন জানল মহাদেব সেনের ঘুম এখনও ভাঙেনি। সে বারান্দা দিয়ে এগোতেই তিস্তাকে দেখতে পেল। একজন বয়স্কা মহিলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখেই তিস্তা হাসল, "গুড মর্নিং।"

অর্জুন বলল, "সুপ্রভাত। উনি কি এখনও ঘুমোচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ। পুলিশটা বলল না জাগলে ভেতরে যাওয়া নিষেধ। কাল কখন আপনি মোটরবাইক নিয়ে গেলেন আমি টেরই পাইনি।" তিস্তা হাসল।

"আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে ভিজিটার্স রুমে গিয়ে বসতে পারেন।" অর্জুন কথা শেষ করতেই ডাক্তার দাসকে আসতে দেখা গেল। তিনি বললেন, "কী ব্যাপার, উনি কেমন আছেন ? ঘুম ভেঙেছে ?"

অর্জুন বলল, "বোধ হয় না।"

ডাক্তার দাস ঘড়ি দেখলেন, "প্রায় ছ'ঘণ্টা হয়ে গেছে। বলুন, একবার দেখে আসি।"

ডাক্তার দাসের পেছন-পেছন ওরা ভেতরে ঢুকল। মহাদেব সেন সেই একই ভঙ্গিতে ঘুমোচ্ছেন। মুখ খুব প্রশান্ত। ডাক্তার দাস তাঁর হাত তুলে পাল্স্ দেখতে লাগলেন। এই সময় চোখ খুললেন মহাদেব সেন। তাঁর মাথার পাশে তিস্তারা দাঁড়িয়ে ছিল, পায়ের কাছে অর্জুন। সে দেখল মহাদেব সেনের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠছে। তিনি বললেন, "কী ব্যাপার, তুমি এখানে?"

ডাক্তার দাস জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন বোধ হচ্ছে এখন?"

এবার মহাদেব সেন বাকিদের দেখলেন। তিস্তা ঝুঁকে পড়ল, "কেমন আছ দাদু?"

"আরে! আমি কোথায় শুয়ে আছি?"

"থানায়। তোমার খুব শরীর খারাপ হয়েছিল। আমরা চিন্তায় ছিলাম খু-উ-ব।"

"আমি থানায় শুয়ে আছি!" মহাদেব সেন উঠে বসলেন, "কাল রাত্রে, কাল রাত্রে তো অর্জুন এসেছিল। হ্যাঁ, ওর সঙ্গে বেরিয়ে শেষপর্যন্ত থানায় এসেছিলাম। মনে পড়ছে সব। তারপর আমার কী হয়েছিল অর্জুন?" স্পষ্ট চোখে তাকালেন মহাদেব সেন।

অর্জুনের কেমন সন্দেহ হল। সে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আপনি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন?"

প্রশ্নটি শোনামাত্র মহাদেব সেন হতভম্ব হয়ে পড়লেন, দুটো হাত তুলে চোখ রগড়ালেন, তারপর চিৎকার করে উঠলেন, "আরে, এ কী হল?"

তিস্তা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

মুখ ঘুরিয়ে ঘরের সবাইকে দেখলেন মহাদেব সেন, "আমি, আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের সবাইকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কী করে হল! আমার যে কোনও সম্ভাবনাই ছিল না দেখার। আহ্। দিস ইজ মিরাক্ল।" নীচে নেমে দাঁড়ালেন তিনি কথাগুলো বলতে-বলতে।

ডাক্তার দাস তাঁকে বাধা দিলেন, "আপনি এত এক্সাইটেড হবেন না। টেক ইট ইজি।"

"টেক ইট ইজি? আরে, আমার মতো প্রায় অন্ধ হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল, এটা কি রোজকার ঘটনা? মাথা নাড়লেন মহাদেব সেন। তাঁকে খুব খুশি দেখাচ্ছিল। এই সময় সুব্রত সেন ঘরে ঢুকলেন অবনীবাবুর সঙ্গে। তাঁদের দেখামাত্র তিস্তা চিৎকার করে উঠল, "দাদু এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। আমি বাড়িতে যাচ্ছি সবাইকে খবর দিতে।" তিস্তা বেরিয়ে গেল।

সুব্রতবাবু হকচকিয়ে গেলেন, "দেখতে পাচ্ছেন মানে ?"

মহাদেব সেন ছেলের দিকে তাকালেন, "হ্যাঁ সুব্রত, আমি দেখতে পাচ্ছি।"

"কী করে সম্ভব ?"

এবার ডাক্তার দাস বললেন, "অঘটন ঘটে। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে যা অসম্ভব বলা হয়েছে জীবনে তার উলটোটা মাঝে-মাঝে হতে দেখেছি।"

"আপনি ডাক্তার ?" মহাদেব সেন বললেন।

অর্জুন বলল, "হ্যাঁ। উনি ডাক্তার দাস। গত রাত থেকেই উনি আপনার কাছে আছেন বলা যেতে পারে।"

"গত রাত থেকে ! হ্যাঁ, তাই তো, আমি এ কোথায় শুয়ে আছি ?"

"আপনি থানায় রাত্রিবাস করেছেন সার। আমি এখানকার ওসি। অবনীবাবু হাসিমুখে এগিয়ে এলেন হাতজোড় করে।

নমস্কার ফিরিয়ে দিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন মহাদেব সেন, "আমার কী হয়েছিল ?"

সুব্রত সেন বললেন, "পরে শুনবেন। এখন বাড়ি চলুন, আপনার বিশ্রামের দরকার।"

মহাদেব সেন মাথা নাড়লেন, "সারারাত ঘুমিয়ে এখন আবার বিশ্রামের দরকার হবে কেন ? ডাক্তার, আপনি বলুন তো আমার কী হয়েছিল ?"

ডাক্তার দাস বললেন, "আপনি খুবই এক্সাইটেড ছিলেন। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় আপনার মস্তিষ্ক কাজ করছিল না। খুব অ্যাগ্রেসিভ হয়ে উঠেছিলেন। সেই অবস্থা থেকে সরিয়ে আনতে আপনাকে আমি ঘুমের ওষুধ দিই। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, সেই ওষুধ কাজ শুরু করে অনেক পরে, ভোরের একটু আগে। ততক্ষণ আপনার অবস্থা নর্মাল ছিল না। এখন অনুগ্রহ করে একটু শুয়ে পড়ুন, আমি পরীক্ষা করব।"

মহাদেব সেন বাধ্য ছেলের মতো আদেশ পালন করলেন। তাঁকে পরীক্ষা করার পর ডাক্তার দাসের মুখে হাসি ফুটল, "নাঃ, একদম ঠিক আছেন। এবার বাড়ি যেতে পারেন।"

শুয়ে-শুয়েই মহাদেব সেন প্রশ্ন করলেন, "ক'টা বাজে এখন ?"

অবনীবাবু সময়টা বললেন। মহাদেব সেন বিড়বিড় করলেন, "এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোলাম !"

ডাক্তার দাস বললেন, "আপনার ঘুম শুরু হয়েছিল সাড়ে চারটে থেকে। সময়টা বেশি নয়।"

মহাদেব সেন সোজা হলেন, "আমার একটু টয়লেট যাওয়া

দরকার।”

সুব্রত সেন বললেন, “বাড়িতে চলুন।”

মহাদেব সেন বললেন, “বেশ। তাই চলো। কিন্তু অর্জুন, তুমি আমার সঙ্গে কখন দেখা করছ?”

“আপনি বিশ্রাম নিন। বিকেলের দিকে।”

“না, না। অত দেরি করা চলবে না। আমি আধঘণ্টার মধ্যেই তৈরি হয়ে নেব। তুমি চলে এসো।” ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন মহাদেব সেন। তিস্তার সঙ্গে যে মহিলা এসেছিলেন তিনিও ওঁদের অনুসরণ করলেন। ঘরের জানলা খুলে দিয়ে অবনীবাবু বললেন, “ব্যাপারটা কি হল?”

ডাক্তার দাস বললেন, “আমি বুঝতে পারছি না। গত রাত্রে যখন ওঁকে প্রথম দেখলাম তখন ওঁর দৃষ্টিশক্তি নিয়ে ভাবার প্রশ্নই ছিল না। বদ্ধ উন্মাদ মনে হচ্ছিল ওঁকে। কিন্তু এমন কিছু ঘটে গেছে ওঁর শরীরে, যে-কারণে আমার ইনজেকশন কাজ করতে দেরি করেছিল। ব্যাপারটা কলকাতায় জানাতে হবে।”

অবনীবাবু বললেন, “সেটা জানাবার পরে অনেক সময় পাবেন। কিন্তু সত্যি কি উনি চোখে ভাল দেখতে পেতেন না? আমি বুঝতে পারছি না।”

অর্জুন হতভম্ব হয়ে বসে ছিল। বলল, “এর মধ্যে মিথ্যে কিছু নেই। উনি প্রায় অন্ধ ছিলেন। ওই যন্ত্রটির কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর ওঁর আচরণে পরিবর্তন এল। মনে হয় তারই রি-অ্যাকশনে উনি এখন দেখতে পাচ্ছেন।”

ডাক্তার দাস জিজ্ঞেস করলেন, “কী যন্ত্র?”

অবনীবাবু চট করে ঘুরে দাঁড়ালেন, “একদম ভুলে গিয়েছিলাম। চলুন দেখা যাক।”

ডাক্তার দাস ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলেন না। যেতে-যেতে ওঁকে ওয়াকিবহাল করলেন অবনীবাবু। ভদ্রলোককে বলতে শোনা গেল, “কী আজগুবি গল্প শোনাচ্ছেন!”

নীচের ভল্টের সামনে পৌঁছে অবনীবাবু ডাক্তার দাসকে জিজ্ঞেস করলেন, “কোনও সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন?”

ভদ্রলোক জবাব দেওয়ার আগেই অর্জুন বলল, “দিনের বেলায় ওটা শোনা যায় না। অন্তত রামচন্দ্র রায় তাই বলেছেন।”

“ভদ্রলোক সঠিক কথা নাও বলতে পারেন।” অবনীবাবুর ইঙ্গিতে সেপাই তালা খুলল।

ডাক্তার দাস বললেন, “দূর মশাই, আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।”

ঘরের যে-কোণে সুটকেসটাকে ঢুকিয়ে রেখেছিল অর্জুন, সেইখানেই

ওটা পড়ে আছে। অবনীবাবু একটানে সেটাকে র‍্যাকের আড়াল থেকে বের করতে পারলেন না। অর্জুন সেইভাবেই ঢুকিয়ে রেখেছিল। এখন বলল, "তালা লাগানো নেই। সাবধানে।"

সুটকেস থেকে থার্মোকোলের বাক্সগুলো খুলে যন্ত্রটাকে তুলে আনা হল। ধাতব বস্তুটি শব্দহীন। অর্জুনের খেয়াল হল, রামচন্দ্র রায়ের বাড়িতে যখন এটাকে সে দেখেছিল তখন এর ভেতর থেকে আলো বের হচ্ছিল। এখন কোনও আলোই নেই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যন্ত্রটিকে দেখে অবনীবাবু বললেন, "জিনিসটা কি তাই, বোঝা যাচ্ছে না।"

"সিগন্যাল রিসিভিং মেশিন। যখনই এটা সেই সিগন্যাল পায় তখনই এর ভেতর থেকে আলো বের হয় দপদপ করে।" অর্জুন গম্ভীর গলায় বলল।

অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সিগন্যালটা পায় কার কাছ থেকে ?"

"সেটা জানি না। কাল রাত্রে যখন রামচন্দ্রবাবু সিগন্যালের শব্দ পাচ্ছিলেন তখন ওটা থেকে আলো বের হতে দেখেছি আমি।" অর্জুন বলল।

এতক্ষণ ডাক্তার দাস যন্ত্রটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন, এবার বললেন, "একটা কথা খুবই বিনীতভাবে জানতে চাইছি। এটা যদি একটা সিগন্যাল রিসিভ করার মেশিন হয় তা হলে এর কাছাকাছি এলাকায় পৌঁছে মহাদেববাবুর নার্ভ বিকল হয়ে গেল কী করে, আর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন কোন যুক্তিতে ?"

অবনীবাবু বললেন, "তাই তো !"

অর্জুন বলল, "এইটে জানতে আরও কিছু সময় লাগবে। আমরা এর মধ্যে জেনেছি এই যন্ত্রের কাছাকাছি এলে বেশিরভাগ মানুষের কিছুই হয় না। যেমন আমি, শঙ্করবাবু, ল্যাংড়া-পাঁচু, থানার সেপাইরা, এমনকী আপনারাও। কারণ আপনারাও কাল রাত্রে কোনও সিগন্যাল শুনতে পাননি। কিন্তু কিছু-কিছু মানুষের পরিবর্তন হয়। আজ সকালে রামচন্দ্র রায় এসেছিলেন, কারণ যন্ত্রটির সঙ্গে রাত কাটানো তাঁর কাছে নেশার মতো হয়ে গেছে। ওঁর শরীরে যে বাতের ব্যথা ছিল তা উধাও হয়ে গিয়েছিল যন্ত্রটির সঙ্গে রাত কাটিয়ে ! কিন্তু নির্যন্ত্র থাকার ফলে সেটা আবার ফিরে এসেছে।"

"শব্দটা কী বললেন ভাই ? নির্যন্ত্র ?" ডাক্তার দাস জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ। যদি নির্জন, নির্বান্ধব হতে পারে, তখন নির্যন্ত্র হবে না কেন ?" অর্জুন হাসল। তারপর ঘড়ি দেখল।

অবনীবাবু হঠাৎ পুলিশি গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন, "কার্ভালোর পেট থেকে খবর বের করতে হবে যে, কোথায় সে যন্ত্রটা পেয়েছে ?"

"সে যদি আর না ফেরে ?"

"এত দামি একটা জিনিস ফেলে রেখে কতদিন বাইরে থাকবে ?"

"ভদ্রলোক কিন্তু এক মাস ধরে উধাও।"

"ওই লোকটারও কোনও রি-অ্যাকশন হয়নি। তাই তো ?"

"হ্যাঁ, কার্ভালোও আমাদের দলে।"

"এটাই অদ্ভুত। হ্যাঁ মশাই এটার সঙ্গে অ্যাটমিক ব্যাপারের কোনও সংযোগ নেই তো ? এই যে আমি ধরলাম।" অবনীবাবুকে এবার নার্ভাস দেখাল।

"সেটাও জানা দরকার।" অর্জুন গম্ভীরভাবে বলল, "আমি এখন মহাদেববাবুর বাড়িতে যাব। যাওয়ার সময় এটাকে সঙ্গে নেব।"

"এটাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যাবেন ?"

"কেন ? দিনের বেলায় অসুবিধে কোথায় ?"

"আরে মশাই, এত মূল্যবান জিনিস, ওঁর কাছে যাওয়ার দরকার কী ?"

"এই শহরে একমাত্র উনিই এ-বিষয়ে কিছু বলার ক্ষমতা রাখেন। ভদ্রলোক চিরকাল বিজ্ঞানচর্চা করে এসেছেন।"

অবনীবাবু ইতস্তত করছিলেন, "এরকম জিনিস যে-কোনও মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। তা ছাড়া পথে যদি কিছু হয় তা হলে— ! বরং উনি তো এখন ভাল আছেন, এখানেই এসে দেখতে বলুন না !"

অনেক তর্কের পর অবনীবাবু রাজি হলেন। কিন্তু পুলিশের জিপে অর্জুন যন্ত্রটিকে নিয়ে যাবে এবং সঙ্গে সেপাই থাকবে। অবনীবাবু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এই অদ্ভুত যন্ত্র পাওয়ার খবর পাঠাতে দেরি করলেন না। এটা নাকি তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

জিপে বসে থানার বাইরে আসামাত্র অর্জুন দেখল রাস্তার একপাশে রামচন্দ্র রায় ছাতি মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রলোককে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। অর্জুন পুলিশ-ড্রাইভারকে বলল গাড়ি থামাতে। তাকে দেখতে পেয়ে রামচন্দ্র রায় এগিয়ে এলেন, "আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। আরে, ওটাই তো কার্ভালোর সুটকেস, তাই না ?"

অর্জুন দেখল রামচন্দ্রবাবুর চোখ চকচক করে উঠল। সে সেটাকে গুরুত্ব না দিয়ে বলল, "আপনি এখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন ? পাগল হয়ে গিয়েছেন নাকি ?"

"তা বলতে পারেন। বাড়ি গিয়ে শুনলাম থানায় এসেছেন, তাই।" রামচন্দ্রবাবু কাঁচুমাচু হলেন, "আসলে আমার মনে হচ্ছে জীবনের অনেক কিছু হারিয়ে গিয়েছে। ফাঁকা লাগছে।"

"উঠে আসুন জিপে।" অর্জুনের মায়া হল।

চটপট জিপে উঠলেন রামচন্দ্র রায়, "নাইনটিন ফর্টি নাইনে আমি একটানা বাহাত্তর ঘণ্টা জিপ চালিয়েছিলাম। নাওয়া-খাওয়া সব মাথায়

উঠেছিল।"

অর্জুন বলল, "থামেননি ?"

"ওই যখন তেলের দরকার হত, তখনই।" রামচন্দ্র হাসলেন, "এখানে, মানে ইন্ডিয়ায় নয়। অস্ট্রেলিয়ায়। জাহাজ থেকে একটা জরুরি খবর নিয়ে ছুটতে হয়েছিল।"

"বাব্বা, আপনার তো অভিজ্ঞতা অনেক।"

"তা তো বটেই। বই লিখলে ইয়া মোটা হয়ে যেত।"

"লিখুন না।"

"ছাপবে কে ? এ-দেশে তো গুণির কদর নেই। কার বাড়ি ?"

অর্জুনের ইশারায় ড্রাইভার মহাদেব সেনের বাড়ির সামনে জিপ থামিয়েছিল। সুটকেস নিয়ে নামতে-নামতে অর্জুন বলল, "আপাতত এই শহরে আপানার সঙ্গে মিল আছে যে একমাত্র মানুষটির, তিনি এই বাড়িতে থাকেন। গতরাত্রে তাঁকে আপনার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

"এখানে কেন আনা হল ?"

"উনি একজন বিজ্ঞানী। আপনার, আমার চেয়ে অনেকগুণ বেশি জানেন। ওঁর সাহায্য দরকার এই রহস্য সমাধান করতে। আপনিও আসুন না !" অর্জুনের অনুরোধে রামচন্দ্র রায় যেন বাধ্য হয়েই অনুসরণ করলেন।

বাড়ির সবাই প্রস্তুত ছিলেন। তিস্তা ওদের মহাদেব সেনের ঘরে নিয়ে যাওয়ামাত্র তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ওটা কী ?"

"এটাই কার্ভালোর রেখে যাওয়া সুটকেস।" অর্জুন সযত্নে মেঝের ওপর রাখল সুটকেসটাকে। মহাদেব সেনকে এখন অনেকটা স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। চোখের চশমা খুলে তিনি বললেন, "এঁর সঙ্গে কোথায় দেখা হল ?"

"থানার সামনে।" জবাব দিয়ে অর্জুন দেখল রামচন্দ্রবাবু একদৃষ্টিতে মহাদেব সেনের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন ওঁর ভেতরটা পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। তারপর হাসলেন, "রামচন্দ্র মহাদেবের বাড়িতে এল অর্জুনের সঙ্গে।"

"ধন্যবাদ।" মহাদেব সেনের চোখ ঘরের ভেতর দাঁড়ানো আত্মীয়স্বজনের ওপর পড়ল, "এবার আমরা একটু কাজ করব। তোমরা দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও।"

আদেশ অমান্য করার সাহস কারও হল না, যদিও বেরিয়ে যেতে কারওরই মন চাইছিল না। রামচন্দ্র রায় বললেন, "কাজের সময় আমার থাকা কি উচিত হবে ?"

"নিশ্চয়ই। এখানে আপনি-আমি গিনিপিগ। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার

চেষ্টা করব। অর্জুন, দরজা দুটো বন্ধ করে সুটকেস খোলো। আগে যন্ত্রটাকে দেখা যাক।" মহাদেব সেন বললেন।

দরজা বন্ধ করে সুটকেস খুলে থার্মোকোলের ভেতর থেকে যন্ত্রটাকে বের করা হল। মহাদেব সেন সামনের টেবিলে সেটিকে রাখতে বললেন। জানলা দিয়ে আসা আলো পড়ায় যন্ত্র চকচক করছে। মহাদেব সেন বললেন, "মেটালটা লক্ষ করো। স্টিল অ্যালুমিনিয়াম মেশানো বলে ভুল হবে। তুমি বলেছিলে আলো বেরোতে দেখেছ, কোনও আলো নেই।"

"ওটা সিগন্যাল হলে বের হয় বলে মনে হচ্ছে।"

"হয়তো। মিস্টার রায়, আপনি কি কোনও শব্দ পাচ্ছেন?"

রামচন্দ্র রায় মাথা নাড়লেন, "নাঃ। দিনের বেলায় তো পেতাম না।"

"তা হলে তোমার ধারণাই ঠিক অর্জুন। কিন্তু এই মেটাল কভারটায় কোথাও জোড়ের চিহ্ন নেই। ভেতরে যে যন্ত্রপাতি, না না, অর্জুন, এই জায়গাটা লক্ষ করো।" ঝুঁকে পড়ে দেখতে-দেখতে মহাদেব সেন অর্জুনকে ডাকলেন। অর্জুন দেখল। কিছু একটা খুলে নেওয়া হয়েছে সেখান থেকে। বস্তুটিকে ধরে রাখার হুক এখনও এর গায়ে আছে।

অর্জুন বলল, "এর গায়ে কিছু লাগানো ছিল।"

মহাদেব সেন বললেন, "হুঁ। এখন এই যন্ত্রটি ঠিক কী জিনিস তা জানার জন্যে দুটো পথ আছে। এক, আমরা এই মেটাল কভার ভাঙতে পারি। সেক্ষেত্রে যদি যন্ত্রটাই খারাপ হয়ে যায় তা হলে চিরকাল আফশোস থেকে যাবে। দ্বিতীয় পথটা আরও ক'টা রাত পরীক্ষা করা।"

রামচন্দ্র রায় বললেন, "দ্বিতীয় পথটাই ঠিক। তা হলে আমার বাতের ব্যথাটা কমে যাবে।"

"আপনার বাত আছে?" মহাদেব সেন মুখ তুললেন।

"আর বলবেন না, নাইনটিন ফিফটি ওয়ানে...।"

রামচন্দ্রবাবুকে থামিয়ে অর্জুন বলল, "এটা কোথায়? আফ্রিকায়?"

"একদম ঠিক। অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল আমার। বাঁচার চান্স ছিল না।"

অর্জুন ভদ্রলোককে থামাবার জন্যে বলল, "উনি বলছেন রোজ রাত্রে এই যন্ত্রের সঙ্গে থাকার ফলে ওঁর শরীরে বাতের ব্যথা কমে গিয়েছিল। এক রাত ছাড়াছাড়ি হওয়ায় আবার বেড়ে গিয়েছে। আপনার চোখের ব্যাপারটা কীরকম?"

মহাদেব সেন বললেন, "উনি ঠিকই বলছেন অর্জুন। যখন ঘুম থেকে উঠেছিলাম তখন মনে হয়েছিল সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু

এরই মধ্যে মনে হচ্ছে দৃষ্টিশক্তি কমতে আরম্ভ করেছে। আগের থেকে অনেক ভাল, কিন্তু ওই পাওয়ার বেড়ে গেলে যা হয়।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার কি মনে হয় এটা পৃথিবীতে তৈরি হয়েছে?"

"না হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। যদি কেউ করে থাকেন তা হলে তাঁর পক্ষে এমন ঝুঁকি নেওয়া খুবই বোকামি হবে।"

"বোকামি কেন?"

"তিনি নিশ্চয়ই লুকিয়ে রেখেছিলেন তাঁর আবিষ্কারের কথা। যন্ত্রটা নিশ্চয়ই তাঁর কাছ থেকে চুরি গিয়েছে। প্রতি রাত্রে তিনি সিগন্যাল পাঠান যন্ত্রটার অস্তিত্ব জানার। না, তা হতে পারে না। তা হলে তিনি জেনেই যেতেন যন্ত্রটা কোথায় আছে, এসে নিয়ে যেতেন। যে-যন্ত্র একটি মানুষকে প্রভাবিত করে তার শরীরের ত্রুটি কমিয়ে দেয়, তাকে তিনি অনেক বড় কাজে ব্যবহার করবেন।"

"তা হলে?"

"হ্যাঁ। সেরকমই মনে হয়। এই ধাতব বস্তুটি আমার অচেনা। এর গড়নও অদ্ভুত। দিনের আলো নিভে গেলে পৃথিবীতে সিগন্যালটা আসে অথবা দিনের আলোর জন্যেই সিগন্যাল এলেও এটি অচল থাকে। সিগন্যাল পেলেই যন্ত্রটা সক্রিয় হয়। সক্রিয় যন্ত্রটি থেকে যে-তরঙ্গ বের হয় তা সেইসব মানুষের মস্তিষ্কের কোষে প্রতিক্রিয়া আনে, যাদের গঠনের সঙ্গে এই যন্ত্রে রাখা ফর্মুলার মিল আছে। কিন্তু কেন? কারা এটাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। উদ্দেশ্য কী? তা ছাড়া এই যন্ত্রটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এর শরীর থেকে কিছু একটা খুলে নেওয়া হয়েছে। কী সেটা?" যেন বারংবার নিজেকেই প্রশ্ন করে গেলেন মহাদেব সেন। খুব চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছিল তাঁকে।

অর্জুন বলল, "বেশ, এবার আমরা একটা হিসেবে আসি। আমরা জেনেছি এই যন্ত্রটির একটা অংশ উধাও হয়েছে। দুই, এটি দিনের বেলায় নিষ্ক্রিয় থাকে। তিন, সন্ধের পরেই দূর থেকে ভেসে আসা সিগন্যালে এ রেসপন্স করে এবং ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আবার নিষ্ক্রিয় হয়। তা হলে দিনের বেলায় সিগন্যাল আসে না অথবা এলেও এ গ্রহণ করতে পারে না।"

মহাদেববাবু বললেন, "আমাদের পৃথিবী যখন সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে তখন ওই সিগন্যাল-প্রেরকের কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়। হয়তো সূর্যতাপ সহ্য করতে পারে না।"

অর্জুন বলল, "বেশ। এবার দেখা যাচ্ছে, সন্ধে হওয়ার পর থেকেই ওই যন্ত্রের কাছাকাছি আসামাত্র কোনও-কোনও মানুষ একটা ক্ষীণ শব্দ শুনতে পাচ্ছেন।"

রামচন্দ্র রায় বললেন, "ক্ষীণ কিন্তু ননস্টপ।'

"হ্যাঁ, সেটা একসময় বাড়তে আরম্ভ করে?"

"মিস্টার রায় বলতে পারবেন। আমি গতকাল রিকশায় বসেই যা শুনতে পেয়েছি তাতে মনে হচ্ছিল কালা হয়ে যাব।"

"ঠিকই। সন্ধে থেকে শুরু হয়। একটু-একটু করে বাড়তে থাকে। আমি চটপট রাত্রের খাওয়া খেয়ে নিতাম, কানে শব্দ বাজত। তারপর একসময় মনে হত কানের পরদা ফেটে যাবে। তখন আর জ্ঞান থাকত না।" রামচন্দ্র রায় বললেন।

"হ্যাঁ, আমি এই স্টেজটাই জানতে চাইছি। গত রাত্রে আপনার কানে ব্যথা হচ্ছিল শব্দটার জন্যে, রিকশাতে বসেই। আমার সঙ্গে যখন থানার ভেতরে ঢুকলেন তখনও আপনি স্বাভাবিক কথা বলছিলেন, মনে আছে?" অর্জুন মহাদেব সেনকে জিজ্ঞেস করল।

"মনে আছে। তখন শব্দটা কানের ভেতরে তুমুল হয়ে উঠছিল। যখন নীচের বন্ধ দরজার কাছে পৌঁছলাম তখন ওই আওয়াজের প্রাবল্যে যেন উন্মাদ হয়ে গেলাম।"

"হ্যাঁ। আপনি তখন দরজা খোলার চেষ্টা করছিলেন একাই। প্রচণ্ড শক্তি এসে গেল শরীরে। আপনাকে ধরে রাখা একজন সেপাইয়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মিস্টার রায়, ওই অবস্থায় পৌঁছে আপনিও কি যন্ত্রটার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতেন? সেক্ষেত্রে তো আপনি সহজেই যন্ত্রটাকে পেতেন। ওটা আপনার ঘরে সুটকেসের মধ্যেই থাকত।" অর্জুন তাকাল।

"না। আমি বেরিয়ে পড়তাম। খালি হাতে নয়। কিছু একটা ভারী জিনিস বয়ে নিয়ে যেতাম। কোথায় যেতাম, কেন যেতাম তা জানি না। অনেকটা হাঁটতাম মধ্যরাত্রে। দু-একজন প্রতিবেশী পরের দিন সকালে দেখা হলে জিজ্ঞেস করেছে অতরাত্রে তিস্তা ব্রিজের দিকে কেন গিয়েছিলাম? জবাব দিতে পারিনি।" রামচন্দ্র রায় হাসলেন, "সকালে ডান হাতে খুব ব্যথা হত। এখন মনে হচ্ছে এমনও হতে পারে ওই সুটকেস বয়ে নিয়ে যেতাম। শুধু এই কারণেই একসময় ভয় হল, রাত্রে বেরিয়ে আমি কাউকে খুনও করতে পারি। এই ভয় বাড়তেই আমি থানায় গেলাম ডায়েরি করতে। আপনাকে বলেছিলাম আমার বাড়ির বাইরের দরজায় তালা দিয়ে যেতে।"

"ওই সময়ে আপনি কাউকে দেখেছেন বলে মনে পড়ে?"

"কাউকে বলতে?" মহাদেব সেন জিজ্ঞেস করলেন।

"এমন কেউ যে আপনাকে পরিচালনা করছে।"

রামচন্দ্র রায় বললেন, "আমার মনে হত কেউ পাশে আছে অথচ তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। সে যা বলছে আমাকে, তাই করতে

হচ্ছে।"

"আপনি ?"

"ঠিক এক অনুভূতি নয়। আমি বুঝতে পারছিলাম আমাকে তালা দিয়ে কেউ চাবি নিয়ে গিয়েছে। সেই চাবিটা আছে এই যন্ত্রের মধ্যে। ওই যন্ত্র পেলে আমি মুক্ত হয়ে যাব। কিন্তু তোমরা আমাকে আটকে রেখেছিলে।" মহাদেব সেন বললেন। এই সময় রামচন্দ্র রায় উঠে এসে পরম স্নেহে যন্ত্রের গায়ে হাত বোলালেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনারা দু'জনেই কি আজ রাত্রে এই যন্ত্রটির সঙ্গে থাকার জন্যে কোনও টান অনুভব করছেন ?"

রামচন্দ্র রায় বলে উঠলেন, "নিশ্চয়ই।"

মহাদেব সেন বললেন, "আমার শুধু কৌতূহল হচ্ছে।"

"ওই কৌতূহল থেকেই টান আসবে। এ মশাই নেশার মতন ব্যাপার।" রামচন্দ্র রায় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

"আমাকে একটু ভাবতে দিন। এখনও কয়েক ঘণ্টা হাতে আছে। বিকেলে আমার কাছে এসো অর্জুন। একটা কিছু করতে হবে আজ রাত্রে।"

"আমি নিশ্চয়ই বাদ যাচ্ছি না ?" রামচন্দ্র রায় জিজ্ঞেস করলেন।

"অবশ্যই না।" মহাদেব সেন বললেন।

"তা হলে এটিকে আবার থানায় রেখে আসি ?" অর্জুন বলল।

কেন ?" মহাদেববাবু আপত্তি করলেন।

"এখন এটা সরকারের সম্পত্তি, যেহেতু এর মালিককে পাওয়া যাচ্ছে না।" অর্জুন বলল।

সমস্ত দুপুর অদ্ভুত এক উত্তেজনার মধ্যে কাটল অর্জুনের। শেষপর্যন্ত আড়াইটে নাগাদ সে জগুদার বাড়িতে গেল। জগুদা এখন শিলিগুড়ির স্টেট ব্যাঙ্কে বদলি হয়ে গিয়েছেন। বউদি তাকে দেখে খুব খুশি। অর্জুন ভি সি আরে স্পিলবার্গের 'ইটি' ছবিটা দেখতে চাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেটাকে চালু করে দিলেন। অর্জুন অনেকবার দেখা ছবিটাকে আর একবার খুঁটিয়ে দেখল। কিন্তু তার মনে হল স্পিলবার্গ যেভাবে দেখিয়েছেন, অন্য গ্রহের মানুষেরা এমন হয় না।

বউদিকে ভি সি আর বন্ধ করতে বলে সে বেরিয়ে এসে বাইকে স্টার্ট দিল। এখন বিকেল। কদমতলার মোড় জমজমাট। অর্জুন কালীবাড়ির রাস্তাটা ধরল। সে ক্রমশ নিঃসন্দেহ হচ্ছিল ওই যন্ত্রটির সঙ্গে মহাকাশের অন্য গ্রহের জীবদের একটা সম্পর্ক আছে। এ ছাড়া অন্য কোনও ব্যাখ্যা হতে পারে না। ব্যাপারটা নিয়ে যত সে ভাবছিল, তত এক ধরনের রোমাঞ্চে সে আপ্লুত হচ্ছিল।

থানায় পৌঁছে সে অবাক ! এরই মধ্যে মহাদেব সেন এবং রামচন্দ্র রায় অবনীবাবুর সামনে বসে আছেন। মহাদেব সেনের ছেলে সুব্রত সেনও সঙ্গে আছেন। মহাদেব সেন তাকে দেখে বললেন, "যাক, ঠিক সময়েই এসেছো।"

অর্জুন হেসে আর-একটা চেয়ারে বসল।

অবনীবাবু বললেন, "ডি আই জি হেড কোয়ার্টার্স একটু আগে টেলিফোন করেছিলেন এস পি সাহেবকে। বলেছেন আমাকে কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম নিতে।"

"কেন ?" অর্জুন অবাক।

"ওঁর ধারণা ওভারস্ট্রেন করে আমার মাথা সুস্থ নেই। আমি ওই যন্ত্রটার ব্যাপারটা রিপোর্ট করেছিলাম।"

"আশ্চর্য !"

"হ্যাঁ, আপনাদের জন্যে আমার এই দশা। যাকগে, আজকের প্ল্যান কী ?"

"আমরা যন্ত্রটার কাজকর্ম ভালভাবে দেখতে চাই।"

"কীভাবে ?"

এই সময় মহাদেব সেন কথা বললেন, "আমি একটা উপায় ভেবেছি। সুব্রত জিনিসটা বের করো তো।"

মহাদেববাবুর ছেলে একটা ব্যাগ খুলে দুটো হেডফোন জাতীয় জিনিস বের করে তাঁর বাবার হাতে দিলেন। মহাদেব সেন বললেন, "এটা কানে পরলে কোনওরকম বাইরের শব্দ কানে যাবে না। আমি দেখতে চাই শেষপর্যন্ত ঘটনাটা কোনদিকে যায় !"

রামচন্দ্র রায় বললেন, "সরি ! ওটা আমি ব্যবহার করব না।"

"কেন ?" মহাদেব সেন একটু বিরক্ত হলেন।

"আমি শব্দটাকে শুনতে চাই।"

মহাদেব সেন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অর্জুন বাধা দিল, "ঠিক আছে, উনি যা চাইছেন তাই হোক। আপনি হেডফোনটাকে ব্যবহার করুন। আজ রাত্রে আপনার স্বাভাবিক থাকা প্রয়োজন।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহাদেববাবু প্রস্তাবটা মেনে নিলেন। অবনীবাবু বললেন, "আমি আর-একটা ব্যবস্থা করেছি। সেটা এখন বলব না।"

সন্ধে হওয়ার আগে চা খাওয়ালেন অবনীবাবু। তারপর সবাই ঘর থেকে বের হলেন। শঙ্করবাবু বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। অর্জুনকে দেখে ইশারায় কাছে আসতে বললেন তিনি। অর্জুন এগিয়ে যেতে শঙ্করবাবু বললেন, "আমার বাবা চোখে দেখতেই পান না। যদি মহাদেববাবু ওই যন্ত্রটির সাহায্যে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান তা হলে আমার বাবাও পেতে পারেন। স্যারকে বলুন না, আমি ওঁকে নিয়ে আসতে

পারি ?"

"উনি কোথায় আছেন ?"

"আমার কোয়ার্টার্সে।"

"বেশ, ওঁকে আগে জিজ্ঞেস করুন কোনও সিগন্যালের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন কি না। যদি পান, তা হলে নিয়ে আসুন।" অর্জুন হেসে এগিয়ে গেল।

আজ বিকেলে মহাদেব সেনের দৃষ্টিশক্তি আরও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সুব্রত সেনের হাত ধরে হাঁটছেন তিনি। সকালবেলায় যে-লোকটা টগবগে ছিল, এখন তাঁকে ছেলের হাত ধরে হাঁটতে হচ্ছে। বাইরে দিন ফুরিয়ে আসছে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কিছু ভেবেছেন ?"

মহাদেব সেন বললেন, "হ্যাঁ। আমি আগে থানায় এসেছি, কারণ অবনীবাবুকে দিয়ে ওই ভল্টের ঘরের মেঝে জুড়ে সাদা চুন ছড়িয়ে দিয়েছি। যে ওই ঘরে ঢুকবে তার পায়ের ছাপ ওখানে পড়বে। আমি হেডফোন ব্যবহার করব। যদি সিগন্যালের শব্দ না শুনতে পাই তা হলে আশা করি নর্মাল থাকব।"

ওরা নীচে নেমে ভল্টের দরজার সামনে দাঁড়াল। অবনীবাবু আগে থেকেই সেখানে কয়েকটা চেয়ারের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। সেগুলোয় বসে গল্পগুজব হচ্ছিল। হঠাৎ রামচন্দ্র রায় সোজা হয়ে বসলেন, "শুনতে পাচ্ছি।"

মহাদেব সেন কান খাড়া করলেন, "হ্যাঁ, আমিও পাচ্ছি। সুব্রত ?"

সুব্রত সেন তাঁর হাতে হেডফোন এগিয়ে দিতে তিনি সেটা ভাল করে কানে ঢেকে মাথায় পরে নিলেন।

রামচন্দ্র রায় বললেন, "বিপ বিপ শব্দ হচ্ছে।"

অবনীবাবুর নির্দেশে একজন সেপাই ভল্টের আলো নিভিয়ে দিল। যন্ত্রটাকে সুটকেস থেকে বের করে ভল্টের মাঝখানে একটা টেবিলের ওপর রেখে দেওয়া হয়েছিল। অন্ধকার হতেই তা থেকে আলো মাঝে-মাঝে বের হতে দেখা গেল। মহাদেববাবু পাশে বসা অর্জুনকে বললেন, "তোমার ধারণাটা ঠিক। সিগন্যাল আসামাত্র যন্ত্রটা থেকে আলো বের হয়।"

করিডোরে আলো আছে, ভেতরে নেই। আলোটা ক্রমশ জোরালো হয়ে নিভছে-জ্বলছে। হঠাৎ রামচন্দ্র রায় বললেন, "ডিনারটা করে নিতে পারলে ভাল হত। আজ সারারাত অভুক্ত থাকতে হবে।"

অর্জুন হাসল। ভদ্রলোক নির্ঘাত খেতে খুব ভালবাসেন, নইলে এই সময়ে ডিনারের চিন্তা করতেন না।

হঠাৎ মহাদেব সেন বলে উঠলেন, "এ কী ! সর্বনাশ !"

সবাই ওঁর দিকে চমকে তাকাল। মহাদেব সেন বললেন, "আমি শব্দটাকে শুনতে পাচ্ছি। আমার কান ঢেকে রাখা সত্ত্বেও পাচ্ছি। মনে হচ্ছে শরীরের অন্যসব রন্ধ্রপথ দিয়ে শব্দটা ঢুকে যাচ্ছে। খুবই ক্ষীণ তাই না মিস্টার রায় ?" মহাদেব সেন হেডফোন খুলে ফেললেন মাথা থেকে।

রামচন্দ্র রায় মাথা নাড়লেন, "ঠিক, ঠিক। গোটা রাত সামনে পড়ে আছে, না খেলে খুব দুর্বল হয়ে যাব। শরীর ঠিক না থাকলে কোনও আনন্দকেই আনন্দ বলে মনে হয় না।"

অর্জুন বলল, "কী খেতে চান ?"

মহাদেব সেন ধমকালেন, "থামো। আপনি এ সময়ে খাওয়ার কথা চিন্তা করছেন ?"

রামচন্দ্র রায় হাসলেন, "একবার জলদস্যুদের পাল্লায় পড়েছিলাম। ভোর হলেই খুন করবে বলে গেল। সবাই কান্নাকাটি করছিল। আমি কিন্তু রাতের খাবারটা চেয়ে নিলাম। আমার যুক্তি হল কান্নাকাটি করে দুর্বল হওয়ার চেয়ে খেয়েদেয়ে শক্তিশালী হওয়া অনেক ভাল। শব্দটা বাড়ছে !"

মহাদেব সেন একমত হলেন, "হ্যাঁ। এখন আর বিপ বিপ নয়, একটানা। বাড়ছে কিন্তু বেশ সহ্য করার মধ্যেই আছে। শরীরে একটা রিমঝিম ভাব এসে গেছে।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কেউ আপনাকে সম্মোহন করছে বলে মনে হচ্ছে ?"

"আমেজ লাগছে কিন্তু কারও অস্তিত্ব টের পাচ্ছি না। তাই না মিস্টার রায় ?"

"ঠিক, ঠিক।" চোখবন্ধ রামচন্দ্র রায় মাথা নাড়লেন।

অর্জুন লক্ষ্য করল, টেবিলে রাখা যন্ত্রটা থেকে যে দপ-দপ আলোর ঝলকানি বেরিয়ে আসছিল, তা বদলে গেছে। এখন মৃদু নীলচে আলো বের হচ্ছে। আলোর রেখাটা মাঝে-মাঝে দিক পরিবর্তন করছে মাত্র। সে মহাদেব সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে মহাদেব সেন বললেন, "সঠিক দিকনির্ণয়ে সাহায্য করছে যন্ত্রটা। কিছু একটা আসছে আর তার আসার পথটা জানিয়ে দিচ্ছে ও।"

ঘণ্টাখানেক ধরে এই ধরনের কথাবার্তা চলল। মহাদেব সেন এবং রামচন্দ্র রায় সিগন্যালিং সাউন্ড শুনেই যাচ্ছেন। শুধু তার পরদা বাড়ছে। ওঁদের কথাবার্তা এখনও স্বাভাবিক। ইতিমধ্যে সুব্রত সেন তাঁর বাবাকে সতর্ক করেছিলেন শরীর খারাপ হওয়ার আশঙ্কা জানিয়ে, কিন্তু তিনি কান দেননি। জরুরি কিছু কাজের খবর নিয়ে শঙ্করবাবু

এসেছিলেন অবনীবাবুর কাছে। অবনীবাবু নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে।

রাত দশটা নাগাদ অর্জুনেরই মনে হতে লাগল, বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছে। খেতে হলে এই চেয়ার ছেড়ে উঠতে হয়। কিন্তু ওঠবার ঝুঁকি নেওয়া অসম্ভব। কখন কোন মুহূর্তে কী ঘটে যাবে তা কেউ জানে না। রামচন্দ্র রায় আর খাওয়ার কথা বলছেন না। তাঁকে এখন ঠিক একটি নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো দেখাচ্ছে। শব্দটা বেড়ে গেছে অনেক। মহাদেব সেন গত রাত্রে রিকশায় বসে যেভাবে কান চেপে ধরেছিলেন, এখন সেই ভঙ্গিতে বসে আছেন। যন্ত্র থেকে বের হওয়া আলোটা এখন অতীব উজ্জ্বল। যেন টর্চের আলোর মতো সেটা বাঁ-ডান করে একটা দেওয়ালের ওপর আছড়ে পড়েছে। সেটা দেখে মহাদেব সেন উঠে দাঁড়ালেন, "গতি উত্তর দিকে। শব্দটা আসছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। দূরত্ব খুবই কমে এসেছে, খুবই কম, আঃ!" আস্তে-আস্তে ওঁর কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। অর্জুন সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। সুব্রত সেনকে ইশারা করে সে মহাদেব সেনকে ধরতে বলে প্রায় পাঁজাকোলা করেই ওপরে নিয়ে এল। সামনে পুলিশ জিপের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন শঙ্করবাবু। মহাদেব সেনের শরীর জিপে তুলে দিয়ে অর্জুন বলল, "আপনার ড্রাইভারকে বলুন থানা থেকে সিকি মাইল দূরে গাড়িটাকে নিয়ে যেতে। ওই যন্ত্রটার প্রভাবের বাইরে এখন ওঁকে রাখতে চাই, নইলে গতকালের অবস্থা হবে।"

শঙ্করবাবু ব্যাপারটা বুঝে ড্রাইভারকে হুকুম করলেন। সুব্রত সেন মহাদেব সেনকে ধরে বসে ছিলেন। জিপটা সাত-তাড়াতাড়ি থানার চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। অর্জুন আবার ফিরে গেল নীচে। গিয়ে দেখল রামচন্দ্রবাবুকে দু'জন সেপাই ধরে রেখেছে দু' পাশ থেকে। অবনীবাবু বললেন, "উনি ওই যন্ত্রটাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে চাইছেন। কথা জড়িয়ে গেছে, কিন্তু গায়ে শক্তি এসেছে। মহাদেববাবুকে কোথায় নিয়ে গেলেন?"

অর্জুন বলল, "থানার বাইরে পাঠিয়ে দিলাম। গত রাত্রে উনি থানার গেটের কাছে এসে শব্দটা শুনতে পেয়েছিলেন। ওই যন্ত্র থেকে কিছুটা দূরে সরে গেলে ওঁর ওপর কোনও রি-অ্যাকশন পড়বে না। গত রাত্রের অবস্থা হওয়ার আগে উনি নর্মাল হয়ে যেতে পারবেন।"

রামচন্দ্র রায়ের এখন কোনও হুঁশ নেই। তাঁর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সেপাই দু'জনের জন্যে তিনি উঠে দাঁড়াতে পারছেন না। অর্জুন যন্ত্রটির দিকে তাকাল। আলো বেশ চড়া এখন। দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে চারধার বেশ আলোকিত। গত রাত্রে সুটকেসের ভেতর ওটা থাকায় সে আলোর এই চেহারা ঠাওর করতে

পারেনি। ঘরের মেঝের দিকে তাকাল সে। কোনও দাগ নেই। কোনও প্রাণী বা বস্তু ওখানে গেলে ছাপ ফুটে উঠত।

অর্জুন ঘড়ি দেখল। এখন প্রায় এগারোটা বাজে। মহাদেব সেনের কথা মনে পড়ল তার। "গতি উত্তর দিকে, শব্দটা আসছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, দূরত্ব বেশি নয়।" কিন্তু বেশি নয় মানে কতটা? সে পিছিয়ে এসে অবনীবাবুর কানে নিচু গলায় কিছু বলল। ভদ্রলোক অবাক হলেন, "কিন্তু— "

"একবার দেখাই যাক না।"

"বেশ।" অবনীবাবু নিজেই তালা খুললেন। সাদা মেঝেতে তাঁর জুতোর ছাপ পড়ল। র‍্যাক থেকে থার্মোকোল বের করে যন্ত্রটাকে ঢুকিয়ে দিতেই আলো ঢেকে গেল। এবার যেমন ছিল তেমনই সুটকেসে সব জিনিস ভরে ওটাকে টেবিলে রেখে তিনি বেরিয়ে এসে সেপাইদের বললেন, "মিস্টার রায়কে ছেড়ে দাও।"

সেপাইরা আদেশ করামাত্র রামচন্দ্রবাবু তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। একরকম ছুটেই তিনি টেবিলের কাছে পৌঁছে সুটকেসটাকে তুলে ধরলেন। তাঁর মুখের অভিব্যক্তি একদম অন্যরকম এখন। নিজের জিনিস নিজেই নিয়ে যাচ্ছেন, কারও অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই এমন ভঙ্গিতে সুটকেসটাকে তুলে তিনি সোজা হেঁটে বেরিয়ে গেলেন। বোঝাই যাচ্ছিল এখন তিনি কাউকে চিনতে পারছেন না।

অর্জুন এবং অবনীবাবু ওঁকে অনুসরণ করে ওপরে উঠে আসতেই দেখা গেল শঙ্করবাবু রামচন্দ্র রায়কে জিজ্ঞেস করছেন, "এ কী! সুটকেস নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?"

রামচন্দ্র রায় জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। হনহনিয়ে গেটের দিকে হাঁটতে লাগলেন। শঙ্করবাবুকে ইশারায় শান্ত হতে বলে অবনীবাবু বললেন, "আমরা ঘুরে আসছি।"

জলপাইগুড়ির রাস্তা এখন সুনসান। দোকানপাট বন্ধ। রাস্তায় কোনও রিকশা নেই। রামচন্দ্র রায় সুটকেস নিয়ে সোজা দিনবাজারের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন, তার হাত-পনেরো দূরে অর্জুনরা। অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাচ্ছেন বলে মনে হয় আপনার?"

"উনি রোজ রাত্রে বের হতেন। ভোরের আগে ফিরে আসতেন সুটকেস নিয়ে। এ গল্প নিজেই করেছেন। কোথায় যেতেন, কী করতেন সেটা পরে খেয়াল করতে পারতেন না।" অর্জুন হাঁটতে-হাঁটতে বলল।

"করলা পার হয়ে রায়কতপাড়ার দিকে যাচ্ছেন।"

"হ্যাঁ, এদিকেই ওঁর বাড়ি।"

"বাড়িতে যাচ্ছেন নাকি?"

"মনে হয় না। এটা উত্তর দিক না ?"

"হ্যাঁ, থানার উত্তর দিক।"

অর্জুন বেশ উত্তেজিত হল। মহাদেব সেন যদি ভুল না করে থাকেন, যদি ওই সময়েও ওঁর মস্তিষ্ক ঠিক কাজ করে থাকে তা হলে এতক্ষণে একটা সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। গতি উত্তর দিকে। দূরত্ব বেশি নয়। রামচন্দ্র রায় উত্তর দিকেই যাচ্ছেন।

রাজবাড়ি ছাড়িয়ে নিজের বাড়ির সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়ালেন রামচন্দ্র রায়। দেখে মনে হল, তিনি কিছু ভাবছেন। অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এটাই ওঁর বাড়ি ?"

অর্জুন জবাব দিল, "হ্যাঁ। কিন্তু বাড়িতে আলো জ্বলছে কেন ?"

"আর কেউ থাকেন না ?"

"না।"

"হয়তো ভদ্রলোক কাল রাত থেকেই আর আলো নেভাননি। উনি আবার হাঁটা শুরু করেছেন। এই বয়সেও এত শক্তি, ভাবা যায় না।" অবনীবাবু আবার অনুসরণ আরম্ভ করলেন। অর্জুনের ইচ্ছে ছিল রামচন্দ্র রায়ের বাড়িটাকে একবার দেখে যাওয়া। কিন্তু সেটা সম্ভব হল না। জলপাইগুড়ি বাইপাসের রাস্তায় এসে বোঝা যাচ্ছিল রামচন্দ্র রায় আর চলতে পারছেন না। এখানে রাস্তায় আলো নেই। তারাদের শরীর থেকে নেমে আসা আলোয় এখন চোখ অভ্যস্ত হয়েছে। রামচন্দ্র রায় টলছেন। হঠাৎ ধুপ করে বসে পড়লেন একপাশে। বসার সময়েও সুটকেসটার দখল ছাড়েননি। অন্তত চার-পাঁচ কিলোমিটার পথ তিনি হেঁটেছেন ভারী সুটকেস নিয়ে। এই বয়সে এটাই অস্বাভাবিক।

একটু অপেক্ষা করে অবনীবাবু বললেন, "চলুন দেখা যাক।"

ওরা পাশে এসে দাঁড়াতেও ভদ্রলোকের সম্বিৎ ফিরল না। অর্জুন সুটকেসটা বেশ সন্তর্পণে ওঁর হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে ডালা খুলল। থার্মোকোলের আড়াল থেকে যন্ত্রটা বের করতে চারধার আলোকিত হয়ে গেল। যন্ত্রের গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসা সেই আলো এখন উত্তরমুখী। অবনীবাবু রামচন্দ্র রায়ের নাড়ি পরীক্ষা করলেন, "খুব চঞ্চল, কিন্তু ভয়ের কিছু নেই বলে মনে হচ্ছে। ভদ্রলোককে ফিরিয়ে নেওয়া দরকার।"

অর্জুন বলল, "উনি এখন ক্লান্ত এবং আচ্ছন্ন। আসুন ওঁকে ধরে ওই গাছটার নিচে শুইয়ে দিই। যদি এটাকে ঘুম বলে তা হলে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকুন। ফেরার সময় নিয়ে যাব।"

"ফেরার সময় মানে ? আপনি কোথায় যাবেন ?"

"মহাদেব সেন বলেছেন গতি উত্তরে, দূরত্ব বেশি নয়। এই আলোটাও দেখুন উত্তর দিকই নির্দেশ করছে। যন্ত্রটাকে অন্য মুখে ঘুরিয়ে দিলেই আলোটা উত্তর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। মনে হয়

রামচন্দ্র রায় ঘোরের মধ্যে প্রতি রাত্রে এই উত্তর দিকেই যেতে চেষ্টা করতেন। শরীরের ক্ষমতা ফুরিয়ে যেতে আর পারতেন না, ভোর হলে এই যন্ত্র অকেজো হয়ে যাওয়ায় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আবার বাড়ির দিকে হাঁটতেন। সুটকেসটাকে নেব না, যন্ত্রটাকে হাতে নিয়ে উত্তর দিকে না হয় কিছুটা হাঁটা যাক।" অর্জুন এখন বেশ সিরিয়াস।

অবনীবাবু রাজি হলেন। রামচন্দ্র রায়কে ওরা রাস্তার পাশে একটা গাছের নীচে শুইয়ে দিলেন। যন্ত্রটি নিয়ে আবার হাঁটা শুরু করলে দেখা গেল দূরে একটা গাড়ি আসছে। যন্ত্রটির আলো টর্চের আলোর মতো ওদের পথ দেখাচ্ছিল। গাড়িটা কাছে আসতেই অবনীবাবু হাত তুললেন কিন্তু ড্রাইভার ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। অর্জুন বলল, "এরকম ফাঁকা জায়গায় এত রাত্রে আপনাকে ডাকাত বলে মনে করা অস্বাভাবিক নয়।"

"যা বলেছেন। এখন মনে হচ্ছে জিপটাকে নিয়ে এলে হত।"

"জিপে চেপে রামচন্দ্রবাবুর পেছনে হাঁটাটা স্বাভাবিক ছিল না।"

"এখন মশাই আমারই পায়ে ব্যথা শুরু হয়েছে। আমরা কোন দিকে যাচ্ছি।"

"ডান দিকে তিস্তা ব্রিজ, বাঁ দিকে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন, আলো যাচ্ছে এ-দুটোর মাঝামাঝি সোজা। এই এখন আমাদের গাইড।"

একটু বাদেই রাস্তা শেষ। পথ এখন ডান এবং বাঁ দিকে চলে গিয়েছে। সোজা যেতে হলে মাঠে নামতে হবে। অর্জুন ইতস্তত করছিল। এই মাঠ হাঁটার পক্ষে নিরাপদ নয়। মাটি নরম। কোনও আল চোখে পড়ছে না। কিন্তু হঠাৎ অবনীবাবু উৎসাহী হলেন, "চলুন, এত দূর যখন এসেছি তখন তিস্তা পর্যন্ত যাওয়া যাক।"

অর্জুন দেখল, আলোটা এতক্ষণ একটানা বেরোচ্ছিল, এখন একটু কমছে-বাড়ছে। অবনীবাবুও সেটা দেখলেন। বললেন, "চলুন না। তিস্তা তো পার হতে পারব না। ওই অবধি গিয়ে না হয় ফিরে আসা যাবে।"

অতএব ওরা মাঠে নামল। আলোয় পা ফেলছে সাবধানে। জুতো বসে যাচ্ছে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি স্পিলবার্গের ইটি দেখেছেন?"

"নাঃ। পুলিশের চাকরি করে সময় হয় না।"

"আপনার কথা মানতে পারছি না।"

"কেন?"

"আমি অনেক পুলিশ অফিসারের কথা শুনেছি যাঁরা প্রচুর বই পড়েন, ভাল ছবি দ্যাখেন। একজন অধ্যাপকের সঙ্গে চট করে তাঁদের তফাত বোঝা যাবে না।"

"তাঁরা নিশ্চয়ই অনেক ওপরতলার অফিসার, থানা চালাতে হয় না।"

নিজের জুতোর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, ও দুটো খুলে ফেলতে পারলেই ভাল হত। মাঝমাঠ পেরিয়ে একটা উঁচু বাড়ির ঢিবিতে উঠতে হল। এবং সেখানে উঠেই ওরা দূরে তিস্তা দেখতে পেল। আলোটা এখন দপদপ করছে। জায়গাটা বেশ গরম।

অবনীবাবু চাপা গলায় বললেন, "হঠাৎ যেন চারধার গুমোট হয়ে গেল।"

অর্জুনের মনে হল এখনই কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ওরা ঢিবি থেকে নেমে নদীর দিকে এগিয়ে চলল। তিস্তায় এখন জল নেই। একটি মোটা ধারা মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ওরা বালির চরের পাশে এসে দাঁড়াতে মনে হল দূরে নদীর চরে বালির ওপর যেন কিছু নড়ে বেড়াচ্ছে। অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "দেখতে পেয়েছেন?"

"হুঁ।"

"জিনিসটা কী বলুন তো? শেয়াল ছাড়া তো এখানে কোনও প্রাণী নেই।" অবনীবাবু বেশ হতাশ গলায় বললেন, "বেরোবার সময় তাড়াহুড়োয় রিভলভার নিয়ে আসার কথা খেয়াল করিনি।"

অর্জুন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। অন্ধকার তিস্তার চরে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে এত দূর থেকে ঠাওর করা যাচ্ছে না। যন্ত্রটির আলো এমন স্তিমিত হয়ে এসেছে যে, দু'হাত দূরেও সেটা পৌঁছচ্ছে না। অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এগোবেন না?"

"এখন ক'টা বাজে?"

"দুটো।"

"এখনও ঘণ্টা দুয়েক সময় আছে।"

"মানে?"

"ভোর না হওয়া পর্যন্ত এই যন্ত্রটি সক্রিয় থাকে।"

"তা থাকে, কিন্তু তার সঙ্গে এগিয়ে ব্যাপারটা দেখার কী সম্পর্ক?"

অবনীবাবু প্রশ্নটি করা-মাত্র তিস্তার চরে আলো জ্বলে উঠল। অদ্ভুত নীল আলো। সঙ্গে-সঙ্গে যন্ত্রটির আলো জোরালো হল। নীল আলোটি চর ছেড়ে ধীরে-ধীরে অর্জুনদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। অবনীবাবু উত্তেজিত হলেন, "আরে ভাই, ওটা এদিকে আসছে, কী করবেন?"

অর্জুন বলল, "কিছু করার নেই। বালির ওপরে শুয়ে পড়ুন।"

কথা শেষ হওয়ামাত্রই অবনীবাবু সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়লেন। নীল আলোটা একটা বিশাল বেলুনের চেহারা নিয়ে এগিয়ে আসছিল। অর্জুন যন্ত্রটিকে মাটিতে রেখে খানিকটা তফাতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। নীল আলোর বেলুনটা তখন মাত্র কুড়ি গজ দূরে। সামনে তাকানো যাচ্ছে না। সেই নীল জ্যোতিতে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

নীল আলোর বেলুনটা ধীরে-ধীরে বালির ওপর নামল। অর্জুন দু' হাতে চোখ ঢেকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল। তার মনে হল বেলুনের ভেতরে শিম্পাঞ্জির মতো একটা কিছু বসে আছে। বেলুন স্থির হলে সেটা ওইরকম ভঙ্গি করে। প্রাণীটির মুখ দেখা যাচ্ছে না আলো পেছনে থাকায়, কিন্তু ওর দুটো কান যে অস্বাভাবিক রকমের বড়, তা বোঝা যাচ্ছে। প্রাণীটি খানিকটা স্থির থেকে আবার পর-পর দু'বার ঝুঁকল। একটু অপেক্ষা করল যেন। অর্জুন বুঝতে পারছিল না এমন ক্ষেত্রে কী করা উচিত! এবার প্রাণীটির হাতে কিছু একটা জ্বলে উঠল যার আলোর রেখা সোজা এগিয়ে এল যন্ত্রটির গায়ে।

অর্জুন দেখল আলোটা বারংবার যন্ত্রের গায়ে লেগে পেছনে যাচ্ছে। যেন প্রাণীটি মরীয়া হয়ে যন্ত্রটিকে সচল করতে চাইছে অথচ যন্ত্রটি সাড়া দিচ্ছে না। প্রায় মিনিট দশেক ধরে এইরকম চলার পরে প্রাণীটি আবার বেলুনের মধ্যে ফিরে গেল। এবং সেইসময় অর্জুন পরিষ্কার সিগন্যালিং সাউন্ড শুনতে পেল। পাশ থেকে অবনীবাবু বলে উঠলেন, "শুনতে পাচ্ছেন?"

"অর্জুন চাপা গলায় বলল, "হ্যাঁ।"

"তা হলে কি আমরাও?"

"না। এটা অনুভূতিতে নয়, পরিষ্কার কানে শুনছি। ও বেলুনে ফিরে গিয়ে শব্দটা করছে যন্ত্রটাকে সচল করতে।" অর্জুন বলল।

কিন্তু প্রাণীটির সব চেষ্টা বিফলে গেল। যন্ত্রটি আগের মতোই পড়ে রইল।

এইবার সেই প্রাণীটি যেন মরিয়া হয়ে নীল আলোর বেলুন থেকে বেরিয়ে এল। অর্জুন দেখল, ওটা এদিকে এগিয়ে আসছে। যন্ত্রটির সামনে যখন ওটা পৌঁছে গেছে তখন স্পষ্ট দেখতে পেল। প্রাণীটির শরীরে কোনও লোম নেই। স্পিলবার্গের ছবির মতো বেঁটেখাটো চেহারা, কান দুটো অসম্ভব বড়। মুখের আদল চৌকো, নাক, চোখ, ঠোঁট বোঝা যাচ্ছে না। প্রাণীটি যন্ত্রটিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে যেন খুব হতাশ হল। তারপর সেটিকে শায়িত অর্জুনের সামনে বালিতে রেখে হাত রাখল সেই জায়গায়, যেখান থেকে কিছু খুলে নেওয়া হয়েছে বলে মহাদেব সেন মন্তব্য করেছেন। অর্জুন হতভম্বের মতো উঠে বসল। ওর মনে হল প্রাণীটি তাকে জিজ্ঞেস করছে যন্ত্রের বাকি অংশ কোথায় গেল? তার উত্তর দেওয়া দরকার।

সে মাথা নাড়ল। নাড়তেই প্রাণীটিও মাথা নাড়ল। অর্জুন দু'পাশে নেড়েছিল, প্রাণীটি ওপর-নীচে। অর্থাৎ, অর্জুনের কথা সে বিশ্বাস করেনি।

অর্জুন এবার পরিষ্কার বলল, "আমি কিছুই জানি না।"

প্রাণীটি স্থির হয়ে রইল। তারপর দু' হাতে মুখ ঢাকল।

এই সময় অর্জুনের কানে এল অবনীবাবু বলছেন, "ধরে ফেলুন মশাই। জাম্প, জাম্প।"

অর্জুন কিছু বলার আগে প্রাণীটি হাত সরিয়ে প্রসারিত করতেই অবনীবাবু কোঁক করে একটা শব্দ তুলে স্থির হয়ে গেলেন।

প্রাণীটি এবার অর্জুনের মুখোমুখি হল। তার হাত একবার যন্ত্রে আর-একবার নিজের বুকে ঘুরে আকাশটাকে দেখাতে লাগল। কয়েকবার এমন দেখানোর পর অর্জুন বলল, "এই যন্ত্রটা সম্পূর্ণ হলে তুমি আকাশে যেতে পারবে ?"

প্রাণীটি স্থির হয়ে রইল খানিক। তারপর আবার একই ভঙ্গি করতে লাগল।

অর্জুন বলল, "বুঝতে পেরেছি। এই যন্ত্রটাকে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া দরকার, তাই তো ? বলার সময় ওর হাতও নড়ছিল।

প্রাণীটি এবার যেন খুশি হল। এই খুশির প্রকাশ বোঝা গেল ওর দুটো হাত পরস্পরকে আঘাত করে করতালির মতো আওয়াজ তোলাতে। যন্ত্রটাকে অর্জুনের দিকে সরিয়ে দিয়ে সে তিস্তার চর হাত তুলে দেখাল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "বুঝতেই পারছি তুমি গ্রহান্তরের প্রাণী। কোন গ্রহ ?"

প্রাণীটি মাথা গুঁজে রইল।

"তুমি পৃথিবীতে কেন এসেছিলে ?"

প্রাণীটি এরও জবাব দিল না। অর্জুনের মনে হল বাংলা ভাষাটাকে ও রপ্ত করতে পারেনি। মজা করার জন্যে সে বাংলা স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সবক'টা অক্ষর আবৃত্তির ভঙ্গিতে আওড়ে গেল। সেই সময় প্রাণীটির কান খাড়া হয়ে উঠল। অর্জুন শেষ করতেই প্রাণীটি স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণগুলো পর-পর উচ্চারণ করে গেল। যেন অর্জুন ওগুলো টেপ রেকর্ড করেছিল, এবার বাজানো হচ্ছে।

অর্জুন বলল, "এগুলো বাংলা অক্ষর। এর ওপরে আমাদের ভাষা দাঁড়িয়ে।"

"অনেক ধন্যবাদ।" অর্জুন স্পষ্ট শুনতে পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেল, "আপনি আমাদের ভাষা এর মধ্যেই শিখে গেলেন ?"

"খুব সহজ ভাষা।"

"আমার শুনতে ভাল লাগল। কিন্তু ওঁকে আপনি কী করলেন ?"

"তখন আপনার ভাষা আমি জানতাম না। ওঁর কথা থেকে মনে হয়েছিল মতলব ভাল নয়। কিছুক্ষণ বাদে ঠিক হয়ে যাবেন।"

"আমি বুঝতে পেরেছি এই যন্ত্রটা কাজ করছে না ঠিকভাবে, তাই

তো ?"

"হ্যাঁ। এর সঙ্গে আর-একটা অংশ ছিল। ওটা না পেলে আমি এই গ্রহের আবর্ত ছেড়ে বেরোতে পারব না। আমার হাতে বেশি সময় নেই।"

"আপনি এখানে এসেছিলেন কেন ?"

প্রাণীটি হাত নাড়ল এমনভাবে, যাতে বোঝা গেল সে উত্তর দেবে না। তারপর বলল, "আমি একটা জলের ধারের শহরে নেমেছিলাম। কৌতূহল হয়েছিল। ফিরে যাওয়ার সময় আকাশে উঠে আবিষ্কার করলাম ওটা আমার সঙ্গে নেই। তারপর থেকে আমি খবর পাঠাতাম, ওটা তা গ্রহণ করত। কিন্তু আমাকে ফিরিয়ে দিত না। সেই জলের ধারের শহর থেকে শেষপর্যন্ত ওকে অনুসরণ করে এখানে আমাকেও আসতে হল। তোমাকে খারাপ বলে মনে হচ্ছে না। ওর বাকি অংশটি পেতে তুমি আমাকে সাহায্য করবে ?"

"নিশ্চয়ই। আমার সন্দেহ হচ্ছে কার্ভালো নামের একটি লোক সেটা নিয়ে অসমে গিয়েছে। লোকটা না ফেরা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।"

"কিন্তু আমার সময় নেই। এর মধ্যে আমার সন্ধান শুরু হয়ে গেছে। অসম কোথায় ?"

"অনেক দূরে। অবশ্য আমাদের হিসেবে।"

"আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।"

"কিন্তু কার্ভালোকে আমি চিনি না, যে চেনে তাকে নিয়ে আসতে হবে।"

"আনো। রোজ রাত্রে আমি এই যন্ত্রটাকে চালু করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু একই সঙ্গে অন্য যন্ত্র সাড়া দিত। ফলে আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।"

"ওহো, সেটা অন্য যন্ত্র নয়। আমাদের শহরে দু'জন মানুষ আপনার পাঠানো শব্দ শুনতে পেত। কিন্তু আমরা পেতাম না। এটা কী করে সম্ভব ?"

"আমি জানি না। হয়তো ওদের মস্তিষ্কের গঠন এই যন্ত্রটির মতো।"

"দু'জনের দু'রকম অসুখ ছিল। আপনার এই যন্ত্রের সঙ্গে থেকে সেই অসুখগুলো কমে গিয়েছিল। কিন্তু দিন বাড়তেই আবার সেগুলো ফিরে আসে।"

"স্বাভাবিক। ওরা শুধু যন্ত্রটার প্রভাবে পড়েছিল। ওদের এখানে নিয়ে এলে ভাল কাজ হত। তুমি ভাল লোক, আমার উপকার করো। কাল রাত্রে এখানে এসো ওই যন্ত্রটাকে সম্পূর্ণ করে। আজ চলি।"

অর্জুন দেখল অদ্ভুতদর্শন প্রাণীটি সেই নীল বেলুনের মতো

জিনিসটায় ফিরে গেল। বেলুন ধীরে-ধীরে আকাশে উঠে গেল। তারপর চোখের বাইরে। অর্জুন হতভম্বের মতো বসে রইল কিছুক্ষণ। এইমাত্র যে ঘটনা ঘটে গেল তা শুনলে যে কোনও মানুষ তাকে পাগল বলবে।

ভোর হয়ে আসছে। সে উঠে অবনীবাবুর পাশে গিয়ে কয়েকবার ডাকলেও তিনি সাড়া দিতে একটু দেরি করলেন। জামার বোতাম খুলে দিয়ে অর্জুন বসিয়ে দিতে চেষ্টা করল। অবনীবাবুর ঘুম ভাঙছিল না। অন্ধকার নদীর চরে নামল সে। পুবের আকাশ ইতিমধ্যেই লালচে ছোপ মাখছে। অর্জুন দেখল, তিস্তার চরে কোনও প্রাণের অস্তিত্ব নেই। একটু আগে যে কিছু আবছা দেখেছিল, তা যেন এখন উধাও হয়ে গিয়েছে। সুনসান বালির চরে এখন হাওয়ারা উত্তাল। অনেকটা হাঁটার পরে সে জলের কাছে পৌঁছল। কোনও পাত্র নেই, পকেট থেকে রুমাল বের করে ভাল করে ভিজিয়ে সে দ্রুত ফিরে এল অবনীবাবুর কাছে। এই সময় শেয়াল ডেকে উঠল। এতক্ষণ শিয়ালগুলো কোথায় ছিল ?

অবনীবাবুর সম্বিৎ ঠিকমতো ফিরতে আকাশে যেন আলোর জলসা বসে গেছে। কত রং আর রঙের মিশেল। এখন আর অন্ধকার নেই। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি হাঁটতে পারবেন ?"

নিজের এই অবস্থার জন্যে বেশ লজ্জিত অবনীবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তা পারব।"

ওঁকে কোনওমতে ধরে-ধরে তিস্তা ব্রিজের কাছে নিয়ে আসতেই অর্জুন একটা টেম্পো পেয়ে গেল। এই ভোরে টেম্পোটা ময়নাগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ির দিকে যাচ্ছে। হাত দেখাতেই সেটা দাঁড়িয়ে গেল। অবনীবাবুকে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে অর্জুন পেছনে উঠল। ড্রাইভার যেই বুঝল তার পাশে দারোগা বসেছে তখনই খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে চালাতে লাগল।

সারারাত জেগে এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ! গত রাত্রেও জাগতে হয়েছিল। তখন একটা প্রায়-ভুতুড়ে ব্যাপার ছিল। কিন্তু আজ ? সাইঅ্যান্স্ ফিকশন ছবি বা গল্পকে লোকে ফ্যানটাসি বলে। আজকের এই অভিজ্ঞতার কথা সবাইকে জানালে কী শুনতে হবে ? ওই প্রাণীটি, যদিও প্রাণী বলতে এখন একটু অস্বস্তি হচ্ছে অর্জুনের, মানুষকে আমরা সরাসরি প্রাণী বলে সম্বোধন করি না যখন, তখন মানুষের চেয়ে উন্নত শ্রেণীকে কি প্রাণী বলা উচিত ? উন্নত যে, তা হাড়ে-হাড়ে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু ওর জন্যে এক ধরনের কষ্ট হচ্ছিল। বারংবার বলছিল যে, ওর বেশি সময় নেই। দলছাড়া, দেশছাড়া হয়ে পৃথিবীর আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই যন্ত্রটি সম্পূর্ণ না পেলে কোনওদিন ফিরতে পারবে না ও ! অর্জুন হাতে-ধরা যন্ত্রটির দিকে তাকাল। অন্ধকার চলে

যাওয়ামাত্র এটি আবার নিশ্চল হয়ে গিয়েছে। কোনও আলো জ্বলছে না।

রামচন্দ্র রায়কে যেখানে শুইয়ে রেখে এসেছিল সেখানে পৌঁছে টেম্পো থামাতে বলল অর্জুন। নীচে নেমে চারপাশে দেখল। ভদ্রলোক কোথাও নেই। এমনকী ওই সুটকেসটাকেও চোখে পড়ছে না। অবনীবাবু এখন অনেকটা সুস্থ। তিনিও নামলেন, "গেলেন কোথায় ভদ্রলোক !"

"বোধ হয় ঘুম ভাঙার পর বাড়ি ফিরে গেছেন !" অর্জুন বলল।

"অর্জুনবাবু।" হঠাৎ অবনীবাবুর গলা অন্যরকম শোনাল।

"বলুন।"

"আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি ?"

"নিশ্চয়ই।"

"গতরাত্রের কথা কাউকে বলবেন না। আমি যে কী করে এমন একটা স্বপ্ন দেখে শরীর খারাপ করে ফেললাম, তা এখন মাথায় ঢুকছে না। ওপরওয়ালারা জানতে পারলে আমার সার্ভিস বুকে নোট দেবে। মাথাটা এখনও ঝিমঝিম করছে।"

"আপনার মনে হচ্ছে আপনি স্বপ্ন দেখেছেন ?"

"তা ছাড়া আর কী ! নীল আলো, অদ্ভুত জীব, হাত নাড়ল আর আমার জ্ঞান নেই ?"

"ঠিকই। কিন্তু এটাকে আপনার স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে কেন ?"

"তার মানে ? আপনি কি বলতে চান এগুলো সত্যি ঘটেছে ?"

"সত্যি না হলে আপনি অসুস্থ হলেন কী করে ?"

"ও। ওই জীবটি আমাকে আহত করেছে ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন ? আমার কথা ও বুঝতে পেরেছিল নাকি ?"

"অনুমান করেছিল। আপনার গলার স্বরে ও অনুমান করেছিল আপনি আক্রমণ করতে বলছেন।"

"বিশ্বাস করতে পারছি না। আর হাত নাড়তেই আমি পড়ে গেলাম। গুলি করল না, ছুরি মারল না অথচ আহত হলাম। কিন্তু এখন কোনও চিহ্ন নেই শরীরে।"

"আপনাকে নিঃসাড় করে দিয়েছিল।"

"জীবটি সম্পর্কে আপনার কী ধারণা ?"

"আমাদের পৃথিবীর কেউ নয়। আমরা ওর মতো উন্নত নই।"

"আপনার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

অর্জুন কথাটা শুনে হাসল, "আচ্ছা অবনীবাবু, আপনাকে যদি জাপানি ভাষার অ্যালফাবেটগুলো কেউ একবার শোনায় তা হলে তৎক্ষণাৎ

আপনি জাপানি বলতে পারবেন ?”

“দূর ! তা কি সম্ভব ?”

“আমার মুখে বাংলা অক্ষরগুলো শুনেই ও পরিষ্কার বাংলা বলতে পেরেছে। উন্নত না হলে পারত না। চলুন, ফেরা যাক।” অর্জুন টেম্পোর দিকে এগোল।

“দাঁড়ান ভাই। আপনি বলছেন আমরা গ্রহান্তরের জীবের দেখা পেয়েছিলাম ? ওই যন্ত্রটির সঙ্গে গ্রহান্তরের জীবের সম্পর্ক আছে ? ও যে সিগন্যাল পাঠাত তা মহাদেব সেন আর রামচন্দ্র রায় শুনতে পেতেন ? সেই সিগন্যাল পাঠিয়ে ও ওঁদের প্রায় উন্মাদ করে দিত ? আপনি বলছেন এসব সত্যি ?” অবনীবাবু উত্তেজিত হলেন।

“এরা কেন উন্মাদের মতো আচরণ করতেন তা আমি জানি না, কিন্তু বাকিগুলো সত্যি।”

অর্জুনের কথা শুনে আকাশে হাত ছুড়লেন অবনীবাবু, “মাই গড ! এ কথা ঘোষণা করলে পৃথিবীর সব সাংবাদিক আমাদের কাছে পৌঁছে যাবে।”

“অর্জুন ফিরে দাঁড়াল, “এখনই এটা আমরা ঘোষণা করব না।”

“কেন ?” অবনীবাবু অবাক।

“কারণ, আপনার ওপরওয়ালারা আপনাকে সুস্থ নাও ভাবতে পারেন। আপনি যে-কথা বলবেন তার স্বপক্ষে তো কোনও প্রমাণ দিতে পারবেন না।”

হঠাৎ যেন বুঝতে পারলেন ভদ্রলোক, “ও, হ্যাঁ, তাই তো ? কোনও প্রমাণ নেই। ইস, কাল যদি রিভলভারটাকে সঙ্গে নিয়ে বের হতাম। জানেন, আমি ভাল করে ওর মুখটাকে দেখিনি।”

“ভাল করেছেন। এখন মুখ বন্ধ রাখুন। চলুন।”

দেড় কিলোমিটার পথ আসার পর অবনীবাবু চিৎকার করলেন ড্রাইভারের পাশে বসে, “অর্জুনবাবু, দেখতে পাচ্ছেন ? সুটকেসটা নিয়ে ভদ্রলোক হেঁটে ফিরছেন। দাঁড়াও, দাঁড়াও।”

টেম্পো রামচন্দ্র রায়ের পাশে গিয়ে থামল। অর্জুন দেখল ভদ্রলোক বেশ থতমত হয়ে গেলেন। অন্যায় ধরা পড়ে গেলে মানুষের মুখের অবস্থা যেমন হয়। কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠলেন চটপট, “আপনারা ? এই ভোরে কোত্থেকে আসছেন ?”

অবনীবাবু কিছু বলার আগেই অর্জুন বলল, “একটু কাজে গিয়েছিলাম। আপনি ?”

রামচন্দ্র রায় হাসলেন, “মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলাম। অনেক দিনের অভ্যেস।”

“জাহাজে যখন চাকরি করতেন তখন কী করতেন ?”

সঙ্গে-সঙ্গে যেন নিজের জায়গা পেয়ে গেলেন ভদ্রলোক, "আর বলবেন না, ডেকে পায়চারি করতাম। জাহাজের এ-মাথা থেকে ও-মাথা হাঁটতাম।"

অবনীবাবু চুপচাপ শুনছিলেন, "আপনার হাতে ওটা কী?"

"হাতে? ও, সুটকেস!"

"সুটকেস হাতে আপনি মর্নিং ওয়াক করেন বুঝি?"

"এটা!" ভদ্রলোক বিচলিত হলেন, "অনেকেই বলেন। কিন্তু নেওয়ার সময় খেয়াল থাকে না।"

অর্জুন বলল, "উঠে আসুন। আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।"

"না, না, এটুকুই তো পথ, ঠিক চলে যাব।"

"আপনার বাড়ির সামনে দিয়েই তো যেতে হবে আমাদের। আসুন।" অবনীবাবু ওপরে উঠে এসে রামচন্দ্র রায়কে ড্রাইভারের পাশের আসন ছেড়ে দিলেন।

টেম্পো চললে অবনীবাবু বললেন, "কিরকম মিথ্যে কথা বললেন, অ্যাঁ।"

"মিথ্যে কথা, কিন্তু না জেনে বলেছেন। কাল রাত্রে কোথায় ছিলেন তা ওঁর খেয়ালই নেই।"

"তাই নাকি?"

"আমার তাই বিশ্বাস। উনি যখন হেঁটে গিয়েছিলেন তখনও জানতেন না কোথায় যাচ্ছেন!"

"নিশির ডাকে লোকে হেঁটে যায় শুনেছি।"

"এ-ও সেরকম।"

রামচন্দ্র রায়ের বাড়ির সামনে টেম্পো থামলে তিনি নামলেন। অর্জুন বলল, "আপনি সুটকেসটাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখুন।"

রামচন্দ্রবাবু বললেন, "কিন্তু সুটকেসটাকে খুব হালকা লাগছে।"

"কারণ যন্ত্রটা আমার সঙ্গে আছে। এই দেখুন।"

রামচন্দ্র রায় তাজ্জব হয়ে গেলেন, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

"আপনার কিছুই মনে পড়ছে না?"

"একদম না।"

"এক কাপ চা খাওয়ালে ভেতরে গিয়ে আপনাকে সব বলতে পারি।"

"নিশ্চয়ই। আসুন, আসুন।"

অবনীবাবু বললেন, "আমাকে বাদ দিতে হবে। কাল রাত থেকে থানার বাইরে আছি। এর মধ্যে কোথাও কিছু হয়ে গেলে শঙ্করের পক্ষে সামলানো মুশকিল হবে। আপনি চা খান, আমি চলি।"

অর্জুন মাথা নেড়ে নেমে পড়ল টেম্পো থেকে। যন্ত্রটাকে দিতে

বলল সে।

অবনীবাবু বললেন, "এটার তো থানায় থাকা উচিত।"

"মালিক না পাওয়া গেলে থানায় থাকা উচিত। মনে হচ্ছে মালিকের সন্ধান পাওয়া গেছে। অবশ্য আপনার যদি দিতে আপত্তি থাকে—।" অর্জুন হাসল।

"মানে, আর কিছু নয়, আমি ওপরওয়ালাকে যন্ত্রটার কথা জানিয়েছি তো! ফট করে কেউ যদি চলে আসে তখন অপ্রস্তুত হব। আপনার যদি তেমন দরকার না থাকে তা হলে আমি ভল্টে রেখে দিতে পারি। আর দরকার হলে না হয় চলে আসবেন।"

অর্জুন মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে।"

টেম্পো বেরিয়ে গেল।

রামচন্দ্র রায় বললেন, "পুলিশরা কাউকে বিশ্বাস করে না, না?"

অর্জুন বলল, "নিরাপদে রাখাই তো ভাল। যাক গে, আপনার মাথার পেছনে, জামায় প্রচুর ঘাসের টুকরো লেগে আছে। রাত্রে ঘুমিয়েছিলেন কোথায়?"

নিজের শরীরে হাত বোলাতে-বোলাতে ভদ্রলোক বোকার মতো তাকালেন। অর্জুন হেসে বলল, "চলুন ভেতরে যাই। এক কাপ চা খেয়েই চলে যাব। এখন ঘুম দরকার।"

রামচন্দ্র রায় বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে পকেট থেকে চাবি বের করতে গিয়ে থমকে গেলেন, "আরে, তালা দেওয়া নেই?"

অর্জুন দেখল, তালাটা একটা কড়ায় ঝুলছে বন্ধ অবস্থায়, দুটো কড়াকে আটকায়নি। সে দরজা ঠেলল। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি তালা দিয়েছিলেন?"

"না দিয়ে বের হব কেন?"

"কখন বেরিয়েছিলেন?"

"কখন? মনে পড়ছে না।"

"আপনি বিকেলে বেরিয়েছিলেন। তারপর আর বাড়িতে ফেরেননি। কাল রাত্রে বাইপাসের পাশে একটা গাছের তলায় ঘুমিয়েছিলেন। এসব আমরা জানি। তাই বিকেলে বেরোবার সময় তালা দেননি। তাড়াহুড়োয় বেরিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ঘরের সব আলো জ্বেলে রেখে গিয়েছিলেন। দিনের বেলাতেও আলো জ্বলছিল। তার কারণ কাল রাত্রে আপনার মাথায় ওগুলো নেভানোর কথা ঢোকেনি।"

"তাই যদি হয়, ভেতর থেকে বন্ধ কেন?"

"আর কোনও দরজা আছে?"

"না, একটাই দরজা। ভেতরে উঠোনের পাশে পাঁচিল।"

অর্জুন এবার দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। এই সময় পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, "এই যে মিস্টার রায়, সারারাত কোথায় ছিলেন ?"

"এই একটু... ।" রামচন্দ্রবাবু উত্তর খুঁজে পেলেন না।

"আবার সেই সুটকেস ! যাক গে, কাল ঘরদোর খোলা রেখে চলে গিয়েছিলেন ? চুরি হয়ে যেতে পারত মশাই। সন্ধের পর আপনার বন্ধু এসে দেখেন সব খোলা। তখন তিনি বলাতে আমরা জানতে পারি।" ভদ্রলোক বললেন।

"বন্ধু ? কোন বন্ধু ?" রামচন্দ্র রায় হতভম্ব।

"তা জানি না। একদিন দেখেছিলাম আপনার সঙ্গে এই বাড়িতে। রাত্রে কিছু খেলেন না তিনি। ওঁকেই বলেছিলাম ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়তে। মনে হয় একটু নেশাটেশা করেন, তাই ঘুম ভাঙতে দেরি হচ্ছে। আওয়াজ করুন।" ভদ্রলোক চলে গেলেন। রামচন্দ্র রায় বললেন, "যাচ্চলে ! কে এসে ঘুমোচ্ছে এখানে ?"

বিস্তর শব্দ করার পর ভেতরে মানুষের সাড়া পাওয়া গেল।

দরজাটা খুলছে। অর্জুন দেখল খুব রোগাপটকা একটি মানুষ ঘুমচোখে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে-সঙ্গে রামচন্দ্র রায়-চেঁচিয়ে উঠলেন। উনি যে ভাষায় কথা বললেন তা অর্জুনের বোধগম্য হল না। লোকটাও হাঁ-হাঁ করে উঠল। দু'জনে নিজেদের উত্তেজনা কমাতে কিছুক্ষণ সময় নিল। এবার রামচন্দ্রবাবু অর্জুনের দিকে ফিরলেন, "এই ব্যাটাই হল কার্ভালো। কাল সন্ধেবেলায় অসম থেকে ফিরেছে।"

অর্জুন হাত বাড়াল, "পরিচয় পেয়ে খুশি হলাম।"

ভদ্রলোক হাত মেলালেন, "আমিও।"

রামচন্দ্র রায়ের চেহারাই যেন পালটে গিয়েছে। তিনি বাড়িতে ঢুকে হইহই করতে লাগলেন। তিনি যে মাঝে-মাঝে কার্ভালোর মাতৃভাষায় কথা বলছেন তাও অর্জুনকে বলে ফেললেন। মুখে জলটল দিয়ে চা পেতে মিনিট কুড়ি লাগল। চায়ে চুমুক দিয়ে চেয়ারে বসে অর্জুন কার্ভালোকে বলল, "আপনার ফিরতে খুব দেরি হয়ে গেল, তাই না ?"

"হ্যাঁ। দেরি হয়ে গেল।" কার্ভালোর গলার স্বর খুব মিহি।

"আগে তো জাহাজে কাজ করতেন, এখন কী, ব্যবসা ?"

"অ্যাঁ, হ্যাঁ, ওইরকমই। বয়স হচ্ছে আর কি তেমন পারি !" এবং এতক্ষণে কার্ভালোর খেয়াল হল, "রায়, আমার সুটকেসটা নিয়ে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?"

"সুটকেস ? ওটা একটা শয়তান। শয়তান রেখে গিয়েছিলে তুমি আমার কাছে। জাহাজে চাকরি করার সময় আমাকে যেমন জ্বালাতে, এখনও তাই করছ !" প্রচণ্ড রেগে গেলেন ভদ্রলোক।

কার্ভালো অবাক, "কেন, কী হয়েছে ?"

"কী হয়েছে তুমি জানো না ?"

"কী করে জানব ? আমি কি এখানে ছিলাম ?"

"ওই যন্ত্রটার কথা তুমি জান না ? থার্মোকোলের ভেতর যেটা প্যাক করে রেখেছিলে ?"

"কেন, যন্ত্রটা কী করেছে ?"

"কী করেছে ? আবার প্রশ্ন করছ ?"

"বিশ্বাস করো, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

"রোজ সন্ধেবেলায় আমার কানে বিপ্ বিপ্ শব্দ বাজত। রাত যত বাড়ত শব্দটাও বেড়ে যেত। তারপর একসময় কানে তালা লাগার উপক্রম। তখন আর কিছু খেয়াল থাকত না। সারারাত কী করতাম আমি জানি না। তখন মানুষ খুন করে ফেললেও টের পেতাম না। বুঝতে পারছ। রোজ হত, রোজ।"

"শুধু তোমাকেই ওটা এমন করত ?"

"হ্যাঁ। আর কাউকে নয়। অর্জুনকেও নয়। না, পরে আর একজনকে করেছিল।"

"স্ট্রেঞ্জ। যন্ত্রটা কোথায় ?"

"পুলিশের কাছে।"

"পুলিশ ?" চমকে উঠল কার্ভালো, "পুলিশ এর মধ্যে এল কী করে ?"

"আসবে না ? আমিই গিয়ে বলেছি ওই যন্ত্রটার মালিক তুমি। পুলিশ তোমাকে খুঁজছে।" কার্ভালোকে এবার খুবই নার্ভাস দেখাচ্ছিল। সে সুটকেসটার দিকে তাকাচ্ছিল বারংবার।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি যন্ত্রটা কোথায় পেলেন ?"

"আমি পেলাম, মানে ?"

"যন্ত্রটা আপনার সুটকেসে ছিল।"

"হ্যাঁ ছিল। কিন্তু তার মানে এই নয় আমি পেয়েছি।"

"কিন্তু ওটা এমনি-এমনি আপনার সুটকেসে ঢুকে পড়তে পারে না।"

প্রশ্ন শুনে কার্ভালো প্রথমে গোঁজ হয়ে রইল।

রামচন্দ্র রায় বললেন, "কার্ভালো, তুমি কি কোনও গোলমালে পড়েছ ?"

কার্ভালো মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, ভাই। পড়েছি। কিন্তু সত্যি কথা বললে কি তোমরা বিশ্বাস করবে ?"

"আমরা এতদিন একসঙ্গে কাজ করেছি, তখনও মিথ্যে কথা বলিনি কেউ, আজ কেন তুমি বলতে যাবে ?" রামচন্দ্র রায় খুবই আন্তরিক গলায় কথাগুলো বললেন।

কার্ভালো অর্জুনের দিকে তাকাল, "সারাজীবন যা রোজগার করেছি তা হেসেখেলে উড়িয়ে দিয়েছি। সঞ্চয় বলতে তেমন কিছুই ছিল না। ইদানীং বেশ অর্থকষ্টে দিন যাচ্ছিল। এই বয়সে নতুন করে কাজকর্ম শুরু করা খুবই মুশকিল। আপনি হয়তো জানেন না আমি সমুদ্রের ধারের মানুষ। সমুদ্র ওদিকের বেশ কিছু মানুষকে অন্ন দেয়। অবশ্যই সেটা বেআইনি পথে। যা কিছু বিদেশি জিনিস রাতের অন্ধকারে সমুদ্রপথে আমাদের ওখানে আসত তাই বয়ে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যে গরিব মানুষেরা টাকা পেত। কিছুই না পেয়ে শেষপর্যন্ত আমি ওই বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করব বলে স্থির করলাম।"

কার্ভালো থামতেই রামচন্দ্র রায় চিৎকার করে উঠলেন, "ছি ছি ছি। কার্ভালো, তুমি শেষপর্যন্ত স্মাগলারদের দলে ভিড়েছ ?"

"ভিড়িনি। চাইলেই যে ওরা আমাকে কাজ দেবে ভাবছ কেন ? ওরা আমাকে প্রথমে যাচাই করবে, আমার সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক আছে কি না জানতে চাইবে। তা ছাড়া ঠিক কাকে বললে কাজটা পাওয়া যায় তাও জানতাম না। রাত্রে সমুদ্রের ধারে কেউ যেত না। আমাদের ওখানে প্রবাদ আছে তোমার যদি সমস্যাহীনতার কষ্ট বেশি হয় তা হলে মাঝরাত্রে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়াও। একরাত্রে আমি গেলাম। এলোমেলো ঘুরলাম। হঠাৎ শুনি একটা লোক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে বালির ঢিবির আড়ালে। কৌতূহলী হয়ে কাছে যেতেই সে আমাকে গুলি করতে চাইল। আমি তাকে বললাম, 'আপনার যন্ত্রণা শুনে এসেছি, আমার অন্য মতলব নেই। দয়া করে আমাকে মারবেন না।' নিজের পরিচয় দিতে হল। কাছাকাছি আমার বাড়ি শুনে সে জিজ্ঞেস করল আমি তাকে সাহায্য করতে পারি কি না ! আমি রাজি হলাম। আমার শরীরের ওপর ভর দিয়ে লোকটা কোনওমতে বাড়িতে এল। দেখলাম ওর পায়ে ক্ষতচিহ্ন। সম্ভবত গুলি লেগেছে। কিছুতেই সে সেটা বলল না। লোকটার নাম হেম বড়ুয়া, বাড়ি গুয়াহাটির কাছে।" কার্ভালো থামল।

"আপনি হেম বড়ুয়ার কাছে গিয়েছিলেন ?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। সেটা পরে বলছি। হেম কিছুতেই ডাক্তার ডাকতে দেবে না। তার ধারণা ডাক্তার ফিরে গিয়ে পুলিশকে খবর দেবেই। অথচ ক্ষতর চেহারা খুব খারাপ দেখাচ্ছিল। আমার বাড়িতে আসার সময় ও একটা বড় থলি এনেছিল। থলিটাকে ও ছুঁতে দিত না। দ্বিতীয় দিনে হেমের জ্বর এল। আমার পরিচিত এক ডাক্তারকে ডেকে আনতে বাধ্য হলাম। তিনি দেখে বললেন, তখনই হাসপাতালে নিয়ে যেতে। নইলে পা বাঁচানো যাবে না। কিন্তু হেম কিছুতেই হাসপাতালে যাবে না। ডাক্তার সাধারণ ওষুধ দিয়ে আমাকে আড়ালে বলে গেল এমন রোগীকে যেন বাড়িতে না রাখি। সেই রাত্রে আমার সামনে হেম ওই যন্ত্রটাকে

থলি থেকে বের করল। করে বলল, "এটা কি ধাতু দিয়ে তৈরি জানো ?"

বললাম, "না।"

সে বলল, "তুমি মানুষটা খারাপ নয় তাই বলা যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি ধাতু এটা। বিক্রি করলে কোটি টাকা পাওয়া যাবে।"

জানতে চাইলাম, "জিনিসটা কি ?"

"এর জন্যেই তো গুলিটা লাগল। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘণ্টাতিনেক আগে আমি একটা জিনিস নিতে সমুদ্রে এসেছিলাম। মাইকেলের নাম শুনেছ ? এ-তল্লাটের এখন ওই সেরা স্মাগলার। মাইকেলের সঙ্গেই কাজ ছিল। আমি আর মাইকেল যখন কথা বলছি তখন হঠাৎ আকাশে নীল আলোর বেলুন দেখতে পেলাম। বেলুনটা নীচে নামল। আমাদের থেকে একশো গজ দূরে। কিছু একটা বেলুন থেকে বেরিয়ে এল। মাইকেল ব্যাপারটা দেখে মিনিটখানেক সময় নিল। আমিও কৌতূহলী হয়ে উঠেছি। আমরা দু'জনেই দৌড়লাম ওই বেলুনের দিকে। আর যেহেতু আমি ভাল দৌড়তাম তাই এগিয়ে গেলাম। মাইকেল মরিয়া হয়ে আমাকে গুলি করল। আমি পড়ে গেলাম। মাইকেল আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল। ওই অবস্থাতেও দেখলাম বেলুন আকাশে উঠে গেল। মাইকেলের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। মিনিট পনেরো বাদে আমি কোনওমতে নিজেকে টেনে নিয়ে গেলাম সামনে। মাইকেলের শরীরের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতেই দেখলাম, এই জিনিসটা বালির পড়ে ওপর পড়ে আছে। পাতলা অন্ধকারেই এটা এমন চকচক করছিল যে, বুঝলাম এর মূল্য অনেক। এর শরীর থেকে অদ্ভুত এক আলো বের হচ্ছিল। আমি যন্ত্রটাকে নিয়ে কোনওরকমে ফিরে আসি যেখানে মাইকেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মাইকেলের একটা ব্যাগে এটাকে পুরে একটা বালির ঢিবির পাশে শুয়ে পড়েছিলাম আমি। গতরাত্রে এই ঘরে শুয়ে আবার জিনিসটা দেখলাম। অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু। কিন্তু এটা আমি অসমে নিয়ে যেতে চাই। তুমি আমাকে সাহায্য করবে ? যা দাম পাব তার টেন পার্সেন্ট তোমাকে দেব। বলো রাজি আছ ?"

"কিন্তু আপনি এই শরীর নিয়ে আসামে যাবেন কী করে ?"

"আমি মরব না। হাসপাতালে গেলেই পুলিশ আমাকে ধরবে। আর যদি মরেই যাই তা হলে আমি ঠিকানা দিচ্ছি, সেই ঠিকানায় এইটে পৌঁছে দেবে। তারা যে টাকা দেবে তার নব্বুইভাগ তুমি আমার পরিবারকে দেবে। কথা দাও।"

আমি রাজি হলাম। সে আমাকে দুটো ঠিকানা লিখে দিল। এইভাবে

হঠাৎই টাকা রোজগারের সুযোগ আসায় আমি খুব আনন্দিত হলাম। কিন্তু সেই রাত্রে ওর অবস্থা এত খারাপ হল আমি হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে পারিনি। পরে খবর নিয়ে জেনেছি ওর ডান পা বাদ দিতে হয়েছে। পুলিশ ওকে গ্রেফতার করেছে। আমার ভয় হত আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে পুলিশ আমাকেও ধরবে। তাই আমার সুটকেসে ওটাকে ভরে অসমে যাব বলে বেরিয়ে পড়লাম। কলকাতায় এসে মনে পড়ল রায় এখানে আছে। তাই একটা রাত ওর কাছে কাটিয়ে আমি গুয়াহাটি চলে গিয়েছিলাম।"

"সম্পূর্ণ যন্ত্রটাকে নিয়ে যাননি কেন ?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"তার মানে ?" কার্ভালো চমকে উঠল।

"আপনি জানেন। যাওয়ার আগে আপনি সুটকেস খুলেছিলেন। যন্ত্রটার আর-একটা অংশ আপনি বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু কেন ?" অর্জুন স্পষ্ট বলল।

কার্ভালো মুখ নিচু করল। তারপর বলল, "আপনি বুঝতে পেরেছেন দেখছি। হ্যাঁ, ঠিক তাই। বাড়িতে বসেই দেখেছিলাম মূল যন্ত্রটার গায়ে আর-একটা যন্ত্র লাগানো আছে। দুটোই একই ধাতুতে তৈরি। সেই ছোট যন্ত্রটিকে খুলে আমি অসমে নিয়ে যাব বলে ঠিক করলাম। যদি ওখানে ভাল দাম পাই তা হলে বাকিটাকে নিয়ে যাব। রায়ের কাছে রেখে গেলে সেটা কখনওই হাতছাড়া হবে না বলে বিশ্বাস ছিল।"

"বিশ্বাস ছিল ?" রামচন্দ্র রায় চিৎকার করে উঠলেন, "তুমি আমাকে পাগল হওয়ার আয়োজন করে চলে গেলে, আর বলছ বিশ্বাস ছিল।"

কার্ভালো বলল, "আমি এইটে বিশ্বাস করতে পারছি না। এই যন্ত্র কি করে তোমাকে পাগল করবে ? আর শুধু তোমাকেই করবে কেন ?"

অর্জুন বলল, "এ নিয়ে অনেক ভেবেছি আমরা। পরে শুনবেন। কিন্তু হেম বড়ুয়ার যে লোকের কাছে ওটা বিক্রি করেছেন তার ঠিকানাটা বলুন।"

"বিক্রি ? কে বলল বিক্রি করেছি ?"

"তার মানে ? কী করেছেন ওটা নিয়ে ?"

"ফিরিয়ে এনেছি।"

অর্জুন উল্লসিত হল, "গুড। কী ভাল কাজ করেছেন আপনি জানেন না। কোথায় সেটা ?"

"কেন ?"

"আগে দেখান, তারপর বলছি।"

কার্ভালো একটা ব্যাগ খুলল। তার মধ্যে কাপড়ের পুঁটলি। তার ভেতর থেকে টর্চ লাইটের আকৃতির একটি ধাতব যন্ত্র বের করল সে। অর্জুন কার্ভালোর হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এটাকে

বিক্রি করেননি কেন ?"

"আমি গুয়াহাটিতে পৌঁছবার দিন-দুই আগে মাইকেলের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ লোকটাকে গ্রেফতার করেছিল। আমি শহরে পৌঁছতেই পুলিশ আমার পেছনে লাগে। অনেক কষ্ট করেছি ওদের চোখে ধুলো দেওয়ার। আমার পকেটের পয়সাও শেষ হয়ে গিয়েছিল।" কার্ভালো বলল।

"এত দেরি করলে কেন এখানে ফিরতে ?" রামচন্দ্র রায় জিজ্ঞেস করলেন।

"পুলিশের ভয়ে। রাজাভাতখাওয়া নামের একটা জায়গায় ধর্মশালায় অন্য নাম নিয়ে পড়ে ছিলাম কিছুদিন। তারপর আমি কুচবিহারে। আমার দ্বারা স্মাগলিং ব্যবসা হবে না। কিন্তু তুমিও পুলিশকে সব বলে দিয়েছ। এখন আর আমার পরিত্রাণ নেই।" কার্ভালো খুব দুঃখের সঙ্গে নিঃশ্বাস ফেলল।

"কিন্তু তুমি তো কোনও বড় অন্যায় করনি ?" রামচন্দ্র রায় বললেন।

"পুলিশ সে-কথা বিশ্বাস করবে বলে ভেবেছ ? করবে না।" মাথা নাড়ল কার্ভালো।

অর্জুন যন্ত্রটিকে দেখছিল। আগাগোড়াই ধাতব বস্তুতে মোড়া। নীচে একটা আংটা রয়েছে। ওর মনে পড়ল যে যন্ত্র নিয়ে অবনীবাবু চলে গিয়েছেন, তার গায়ে এমন একটা ব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ, এই বস্তুটি ওই যন্ত্রের গায়ে আটকে যাবে। সে শুনতে পেল, কার্ভালো তার মাতৃভাষায় কিছু বলল রামচন্দ্রবাবুকে। রামচন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন কিন্তু সেটা কার্ভালোকে খুশি করল না। এবার রামচন্দ্র রায় অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কী মনে হয় পুলিশ কার্ভালোকে অ্যারেস্ট করতে পারে ? ও যে অর্থাভাবে স্মাগলিং বিজনেসে যেতে চেয়েছিল তা সত্যি, কিন্তু ও সেটা আরম্ভ করেনি। এই যন্ত্রটার মালিক কে তাই বোঝা যাচ্ছে না। ও নীল আলোর বেলুনে চাপা একজনের কথা বলছে। সে কে বলে আপনার মনে হয় ?"

"ভিন্ন গ্রহের মানুষ।"

"অ্যাঁ। যাঃ, কী যে বলেন ! পৃথিবীর বাইরের কোনও গ্রহে মানুষ আছে নাকি ? দানিকেনের গপ্পো নিশ্চয়ই শোনাবেন না। যা বলছিলাম, কার্ভালোকে একটু সাহায্য করুন। আপনার সঙ্গে দারোগাবাবুর বেশ ভাব আছে, দেখুন না।" রামচন্দ্র রায় বললেন।

অর্জুনের ঘুম পাচ্ছিল না আর। দ্বিতীয় যন্ত্রাংশ হাতে পাওয়ার পর বেশ তাজা লাগছিল নিজেকে। সে কার্ভালোকে জিজ্ঞেস করল, "নীল আলোর বেলুনটাকে আপনার কী মনে হয় ?"

"আমি তো দেখিনি ! মনে হয় ব্যাপারটা সত্যি নয় ।"

"আপনি কী চান ?"

"বাড়ি যেতে চাই । কোনওদিন অন্যায় কাজ করিনি, এবার করার কথা ভেবেছি । কিন্তু সত্যি বলছি, করিনি । আর কখনও করব না ।"

"তা হলে আপনার চলবে কী করে ?"

"জানি না ।"

"আপনি জানেন আপনার ওই যন্ত্রের কল্যাণে রামচন্দ্রবাবুর পায়ের পুরনো বাতের ব্যথা কমে গিয়েছিল । মাঝরাত্রে মাইলের পর মাইল ওই শরীরেও তিনি হেঁটে গেছেন রোজ । অজান্তে একটা উপকার করেছেন আপনি ?"

এই সময় রামচন্দ্রবাবু ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, "কোথায় আর সারল ? আজ সকালেই ওটা একটু-একটু করে ফিরে আসছে ।"

অর্জুন উঠল, "মিস্টার কার্ভালো, এখন কয়েকটা দিন আপনি আপনার বন্ধুর কাছে বিশ্রাম নিন । উনি যন্ত্রটির অভাবে রাত্রে ঘুমোতে পারছেন না । আপনার সঙ্গ পেলে সমস্যাটির সমাধান হবে । যেহেতু এই যন্ত্রাংশটি আপনি যে-কোনও কারণেই হোক ফিরিয়ে এনেছেন, তাই মনে হয় পুলিশ আপনার বিরুদ্ধে কোনও স্টেপ নেবে না । আচ্ছা, চলি, নমস্কার ।"

কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠল কার্ভালোর মুখে । অর্জুন যন্ত্রাংশ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল । এখন রোদ উঠে গেছে । সে একটা রিকশায় চেপে সোজা কদমতলায় যেতে বলল । আজ বিকেল পর্যন্ত একটানা ঘুমোবার জন্যে ছটফট করছিল সে ।

ঠিক বারোটা নাগাদ ঘুম ভেঙে গেল অর্জুনের । ঘরের সবক'টা দরজা-জানলা বন্ধ করে শুয়ে ছিল, যাতে চোখে আলো না ঢোকে । তবু ঘুম ভাঙল এবং আর এল না । খিদে পাচ্ছিল বেশ । মা বাড়িতে নেই । কাজের মেয়েটি রান্নাবান্না করে বসে আছে । স্নান সেরে ভরপেট খেয়েও নতুন করে ঘুম এল না । অমলদা বলতেন পৃথিবীর প্রতিভাবান মানুষেরা দিনে-রাতে চারঘণ্টার বেশি ঘুমোন না । এই হিসেবে সে প্রতিভাবান মানুষের পর্যায়ে পড়ছে আজ ! এটা এমন সময় যে, যার বাড়িতেই যাবে সে বিরক্ত হবে । অর্জুন বাইক বের করতে গিয়ে হোঁচট খেল । গতকাল সে ওটাকে থানায় রেখেই বেরিয়েছে । অতএব রিকশা নিয়ে থানায় পৌঁছে গেল সে । খবর নিয়ে জানল অবনীবাবু নিজের কোয়ার্টার্সে ঘুমোচ্ছেন ।

বাইকে চেপে অর্জুন ছুটল জলপাইগুড়ি বাইপাশের দিকে । ব্রিজ থেকে বাঁ দিকের চরে নেমে গেল সে । বালির ওপর বাইক চালাতে

অসুবিধে হচ্ছিল। ওটাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে সে হেঁটে চরের সেই জায়গায় গেল যেখানে নীল আলোর বেলুনকে সে প্রথম দেখেছিল। বালির ওপর কোনও ভারী জিনিস চেপে বসেছিল এখানে, অর্জুন স্পষ্ট দেখতে পেল। আর কোথাও কিছু নেই। বালি নিয়ে হাওয়া খেলা করে যাচ্ছে তিস্তার চরে। সে ফিরে এল বাইকের কাছে।

বেলা তিনটে খুব অসময় নয়। অর্জুন মহাদেব সেনের বাড়ির সামনে বাইকে এসে একটু ভাবল। তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া নাড়ার আগেই সেটা খুলে গেল। তিস্তা দাঁড়িয়ে আছে। অর্জুনকে দেখে হাসল সে, "কাল দাদুকে সাত-তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে আমরা সবাই আপনাকে ধন্যবাদ দিয়েছি, শুধু দাদু একটু অপ্রসন্ন হয়েছেন আপনার ওপর।"

"কেন ?"

"কাল ওঁকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাই।"

"উনি কী বিশ্রাম করছেন ?"

"না। আসুন।"

দোতলায় উঠে মহাদেব সেনের কাছে পৌঁছে অর্জুন দেখল তিনি মগ্ন হয়ে বই পড়ছেন। চোখে চশমা ঠিকই, কিন্তু এটাই তো দু'দিন আগে অবিশ্বাস্য ছিল। তিস্তা ডাকতে তিনি মুখ ফেরালেন কিন্তু মাথা পরিষ্কার হল না তৎক্ষণাৎ। অর্জুন বলল, "পড়তে অসুবিধে হচ্ছে না ?"

"অ্যাঁ ? ও, অর্জুন। খুব সামান্য। আগে তো পড়তেই পারতাম না। তোমরা আমাকে হঠাৎ এড়িয়ে চলছ কেন হে ? গত রাত থেকে কোনও পাত্তা নেই ?"

"কোথায় এড়িয়ে চলেছি ? আপনার সূত্র অনুসরণ করেছি।"

"তার মানে ?"

"গত রাত্রের কথা আপনার মনে আছে ?"

"হ্যাঁ, তোমরা আমাকে জোর করে থানার বাইরে নিয়ে এসেছিলে !"

"কারণ, আপনি একটু একটু করে প্রভাবিত হয়ে পড়ছিলেন। বেরোবার আগে আপনি শব্দের দূরত্ব এবং দিক অনুমান করেছিলেন। কী করে ?"

"খুব সোজা। উত্তর দিকে কান পাতলে আওয়াজটা স্পষ্ট হচ্ছিল।"

এবার অর্জুন মহাদেব সেনকে গতরাত্রের অভিজ্ঞতা খুলে বলল। শুনতে-শুনতে বৃদ্ধ সোজা হয়ে বসলেন। অর্জুন কথা শেষ করলে বললেন, "কী বলব একে ? অলৌকিক ? এত বছর মহাকাশ নিয়ে কাজ করেছি, কখনওই তো এমন অভিজ্ঞতা হয়নি ? ফ্লাইং সসার জাতীয় ব্যাপারগুলো উত্তেজিত করত এবং সেই পর্যন্ত। কিন্তু ওকে তুমি কীভাবে সাহায্য করবে ? আমার মনে হয় ওর জ্বালানি শেষ হয়ে

আসছে। পৃথিবী থেকে না চলে গেলে ও আর কখনওই যেতে পারবে না। অথচ ওর মহাকাশের জাহাজকে ওড়াবার জন্যে ওই যন্ত্রটাকে সম্পূর্ণ পাওয়া দরকার!"

"হ্যাঁ। কার্ভালো ফিরে এসেছেন। তাঁর কাছে আমি যন্ত্রের আর-একটা অংশ পেয়েছি।"

"বাঃ। গুড। তা হলে চলো, ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।"

"হ্যাঁ। আমি সন্ধেবেলায় আপনার কাছে আসব। কিন্তু আমি চাই না বেশি লোক ব্যাপারটা জানুক। আমাদের অতিথি বাজে লোকদের সহ্য করতে পারে না।"

"ঠিক আছে, আর কেউ জানবে না।"

পাশে দাঁড়িয়ে তিস্তা এতক্ষণ সব শুনছিল। এবার আবদারে গলায় বলল, "দাদু, আমি তোমার সঙ্গে যাব। প্লিজ দাদু, কেউ কিছু জানতে পারবে না।"

মহাদেব সেন মাথা নেড়ে যাচ্ছিলেন।

সন্ধে নাগাদ অর্জুন থানায় এল একটা ব্যাগ নিয়ে। অবনীবাবু নিজের চেয়ারে বসে ছিলেন। দেখামাত্র হাসলেন, "কী ব্যাপার অর্জুনবাবু?"

"যন্ত্রটা চাই।" অর্জুন বলল।

"কেন?"

"যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে না?"

"জিনিসটা কার?"

"আরে, কাল দেখলেন না?"

"সত্যি বলতে কী, গতরাত্রের ব্যাপারটা আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। তা ছাড়া কলকাতা থেকে বড়সাহেবরা জানিয়েছেন, ওটাকে অবিলম্বে সেখানে পাঠিয়ে দিতে।"

"অসম্ভব।"

"কেন?"

"ওটা আজই ফিরিয়ে দিতে হবে।"

"না মশাই। ওপরওয়ালারা আমাকে ছাড়বে না ওটা দেখতে না পেলে।"

"অবনীবাবু, আপনি বুঝতে পারছেন না কেন, একটি প্রাণের নিরাপত্তা নষ্ট হয়ে যাবে ওটা আজ ফেরত না পেলে!"

"এটা একা তো কিছু উপকার করবে না। ওর আর-একটা অংশ না পেলে কোনও কাজ দেবে? মাথাটা ঠাণ্ডা করুন।"

হঠাৎ অর্জুনের মনে হল, অবনীবাবু আজ স্বাভাবিক নন। এখন এই অবস্থাতে কার্ভালোর ফিরে আসার কথা বলা ঠিক হবে না। সে

কার্ভালোকে যে কথা দিয়ে এসেছে অবনীবাবু তা নাও মানতে চাইতে পারেন। ওপরওয়ালা জেনে যাওয়ার পরে ভদ্রলোক নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না।

"অর্জুন বলল, "এক কাজ করি। চলুন, ওটাকে নিয়ে কালকের স্পটে যাই। গতরাত্রে যে এসেছিল তাকে বলি সমস্ত ব্যাপারটা।"

হঠাৎ অবনীবাবুর চোখ চকচক করে উঠল। একটু ভাবলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন, "চলুন। আপনার কথা রাখছি। তবে আজ আমি সঙ্গে রিভলভার রাখব।"

"কেন ?"

"গতরাত্রে ও আমাকে আঘাত করেছিল। আজ আমার পালা।"

অর্জুন বুঝল গোলমাল হবে। কিন্তু এ ছাড়া পুলিশের লকার থেকে যন্ত্রটাকে বের করার অন্য কোনও উপায় নেই।

অবনীবাবু চেয়েছিলেন একটা বিরাট বাহিনী নিয়ে যাবেন যাতে প্রাণীটিকে গ্রেফতার করা সহজ হয়। ওই প্রাণী, যন্ত্রটি একসঙ্গে প্রচারমাধ্যমে হাজির করলে আর দেখতে হবে না। কিন্তু অর্জুন এতে কিছুতেই রাজি হল না। সে বোঝাল, প্রাণীটি বেশি মানুষের উপস্থিতি টের পাবেই এবং সেক্ষেত্রে সে আর নীচে নামবে না।

যন্ত্রটাকে বের করে কোলে নিয়ে গাড়িতে উঠেছিলেন অবনীবাবু। মহাদেব সেন যেতে চান শুনে খুব একটা খুশি হলেন না। জিপের সামনে ওঁর পাশে অর্জুন বসে ছিল। মহাদেব সেন তৈরি ছিলেন। অর্জুন তাঁকে সামনের আসন ছেড়ে পেছনে চলে গেল। তিস্তা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "ঠিক আছে, মনে রাখব, তোমরা আমাকে নিলে না।"

হেসে ফেলল অর্জুন, "তুমি গিয়ে কী করতে ?"

"অটোগ্রাফ নিতাম।" তিস্তা বলল।

তিস্তার চরের কাছে পৌঁছে মহাদেব সেন বললেন, তিনি সেই শব্দটা শুনতে পাচ্ছেন। খুব ক্ষীণ। অর্জুন দেখল, অবনীবাবুর হাতে ধরা যন্ত্র থেকে সবে আলোর ছিটে বের হচ্ছে। সে অবনীবাবুকে বলল, "যন্ত্রটা একবার দেখি। আলোটা অদ্ভুত লাগছে।"

নিজে লক্ষ্য করে বুঝতে না পেরে ভদ্রলোক শেষপর্যন্ত অর্জুনের হাতে ওটা দিলেন। অন্ধকারে হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল না, কারণ মহাদেব সেনের হাতে টর্চ ছিল। অর্জুন চট করে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে অন্য যন্ত্রাংশটি বের করল। তারপর আন্দাজে চেষ্টা করল আংটা দুটোকে জুড়ে দিতে। পাঁচ-ছ' পা যাওয়ার পর সে দুটো লেগে যেতেই মহাদেব সেন বলে উঠলেন, "যাঃ।"

অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল ?"

"শব্দটা হারিয়ে গেল।"

"ভাল করে শুনুন।"

"নাঃ, আর পাচ্ছি না।"

"চেষ্টা করুন।"

"দূর ! চেষ্টা করে কি এসব শোনা যায় ! কাল কোথায় এসেছিলে তোমরা ?"

অর্জুনের বুকের ভেতর যেন ড্রাম বাজছে এখন। সে বলল, "এখানে।" কিন্তু এটা কী হল ? দুটো যন্ত্র জুড়ে গেলে মহাদেববাবুরাও কিছু শুনতে পান না ? অবশ্যই। প্রথম রাত্রে যন্ত্রটা জোড়া ছিল বলে কার্ভালো থাকা সত্ত্বেও রামচন্দ্র রায় কিছুই শুনতে পাননি। তার মানে এটা এখন শুধু শব্দ গ্রহণ করছে না, পাঠিয়েও যাচ্ছে। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এটা গ্রহণ করত, এরা যেটা পাঠাত তা অতি সূক্ষ্ম বোধসম্পন্ন মস্তিষ্কে গিয়ে আঘাত করত।

দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় কাটল। শেষপর্যন্ত অবনীবাবু যন্ত্রটি নিয়ে মাটিতে রাখলেন। দপ্‌দপ্‌ করছে আলো। হঠাৎই দেখা গেল তিস্তার চরে কিছু একটা নেমেছে। মহাদেব সেনকে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন ?"

"না।"

অবনীবাবু বললেন, "আমি পাচ্ছি। আসুক কাছে, রেঞ্জের মধ্যে।" তিনি রিভলভার বের করে নিলেন। অর্জুন ওঁর হাত ধরল, "কী করছেন আপনি ?"

"আই ওয়ান্ট হিম।"

"না। কখনওই নয়।"

"মারব না। এমন আহত করব যাতে পালাতে পারবে না কিন্তু পরে চিকিৎসা করে সারানো যায়। আমি ওকে জীবন্ত চাই।" অবনীবাবু বললেন।

"এসব কী কথা। ছি ছি ছি। ইউ ক্যাননট ডু দিস।" মহাদেব সেন বললেন।

"আমাকে আমার কর্তব্য করতে দিন। কারও যদি কোনও আইডেন্টিটি না থাকে তা হলে তাকে অ্যারেস্ট করার সম্পূর্ণ অধিকার আমার আছে।"

এই সময় দেখা গেল তিস্তার চর থেকে একটা নীল আলোর বেলুন ওপরে উঠে এদিকে এগিয়ে আসছে। বেলুনটা যখন কাছে নেমে এল ঠিক তখনই গুলি চালালেন অবনীবাবু। মনে হল জলের মধ্যে একটা পাথর তলিয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড চিৎকার করে হাত শূন্যে তুললেন ভদ্রলোক। অর্জুন দেখল, ওঁর হাত থেকে মাটিতে কিছু পড়ে গেল। যন্ত্রের শরীর থেকে বেরিয়ে আসা আলোয় মনে হল, একদলা গলিত

লোহা। বাঁ হাতে ডান হাতের কবজি ধরে মাটিতে বসে পড়েছেন ভদ্রলোক। যন্ত্রণায় কাতরে যাচ্ছেন।

নীল আলোর বেলুন থেকে সেই প্রাণীটি বেরিয়ে এল, "আপনাকে প্রথম দেখছি। কিন্তু মনে হয় কোথাও আমাদের সংযোগ হয়েছিল।"

অর্জুন বলল, "ইনি আপনার ওই যন্ত্রের পাঠানো সিগন্যাল শুনতে পেতেন। তা ছাড়া পেশায় একজন বিজ্ঞানী।"

"ধন্যবাদ। আমার যন্ত্র যখন সিগন্যাল ফেরত পাঠাতে শুরু করেছে তখন বোঝা যাচ্ছে তুমি আমার উপকার করেছ। কী দিয়ে এই ঋণ শোধ করতে পারি?"

"ঋণ কেন বলছ?"

"নিশ্চয়ই। আজ ভোরের আগে আমি যদি মহাকাশে না পৌঁছতে পারি তা হলে শেষ হয়ে যাব। তোমাকে আমার বন্ধুত্ব দিলাম।"

"ধন্যবাদ। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। ওই যন্ত্রের অর্ধেকটা যে শব্দতরঙ্গ তুলত তা শুনে মহাদেব সেন এবং রামচন্দ্র রায় অস্বাভাবিক হয়ে যেতেন। কিন্তু একজন দৃষ্টিহীনতা আর একজন বাত থেকে মুক্ত হওয়ার পথে পৌঁছেছিলেন। কী করে?"

"খুব স্বাভাবিক। ওঁদের মস্তিষ্কের যে কোষ শব্দটাকে নিতে পেরেছিল তারাই বলিষ্ঠ হয়ে এই দুটো প্রতিক্রিয়া আনে। কিন্তু পূর্ণমাত্রায় না হওয়ায় ব্যাপারটা খুবই সাময়িক হবে। তুমি চাও এটা পূর্ণতা পাক?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি শুয়ে পড়ুন।"

মহাদেব সেন নির্দেশ পালন করামাত্র তাঁর গলা থেকে তীব্র চিৎকার বের হল। তিনি স্থির হয়ে গেলেন। প্রাণীটি বলল, "কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে দাও। ওঁর শরীরের সমস্ত বিকল কোষ এখনই জীবন ফিরে পাবে। এই লোকটিকে কী করা যায়?"

"কিছু না। উনি বিভ্রমে পড়েছেন। তোমার পূর্ণ যন্ত্র নাও।" অর্জুন যন্ত্রটিকে তুলে ধরতে মূর্তিটি ইশারা করল থামতে। তারপর আলোর বেলুনে ঢুকে সে কিছু চালাতেই একটা আলোর রেখা বেরিয়ে এল। তারই আকর্ষণে যন্ত্রটি সোজা চলে গেল নীল আলোর বেলুনের ভেতরে। প্রাণীটি আবার বেরিয়ে এল, "আমার হাতে আর সময় নেই বন্ধু।"

"তোমাকে আমি সারাজীবন মনে রাখব।" অর্জুন বলে উঠল।

"বিদায় বন্ধু।" প্রাণীটি আবার নীল বেলুনে ঢুকে গেল। বেলুনটি উড়ে গেল তিস্তার চরে। তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কিছু একটা হুস করে উড়ে গেল আকাশে।

অর্জুনের বুক ভার হয়ে গিয়েছিল। সে মহাদেব সেনকে দেখল।

তারপর অবনীবাবুকে। ভদ্রলোক যেন বসে-বসেই ঘুমোচ্ছেন।

ওঁদের জ্ঞান ফেরার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল অর্জুন, অন্ধকার নির্জন নদীতীরে। আকাশে তখন হাজার তারার মালা। শোঁ-শোঁ বাতাস বইছে। হঠাৎ কানে এল মহাদেব সেনের গলা, "অর্জুন!"

"বলুন।"

"চলে গিয়েছে।"

"হ্যাঁ।"

"আপনি?"

"হ্যাঁ। আমি দেখতে পাচ্ছি। এই অন্ধকারেও তারাদের দেখতে পাচ্ছি।"

আনন্দে ভরপুর অর্জুন আকাশের দিকে তাকাল, "ধন্যবাদ, বন্ধু।"